কহেন কবি কালিদাস

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. সন্ধ্যা হয়-হয় করছে 2

২. সায়রার লেখা অটোবায়োগ্রাফির সরল বঙ্গানুবাদ.... 15

৩. বাবার ঘর অন্ধকার...................... 23

৪. মধ্যবয়স্ক এক লোক 35

৫. আত্মজীবনীর তৃতীয় অধ্যায়................. 65

৬. সায়রা বানু এবং মিসির আলি.............. 82

৭. প্রফেসর সরদার আমিন হোসেন.............. 97

৮. শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট থেকে কয়েকটা লাইন..... 100

১. সন্ধ্যা হয়-হয় করছে

কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে
নাই তাই খাচ্ছ,
থাকলে কোথায় পেতে?
–লোকছড়া

০১.

সন্ধ্যা হয়-হয় করছে। এখনো হয় নি। আকাশ মেঘালা। ঘরের ভেতর অন্ধকার। সন্ধ্যা লগ্নে ঘর অন্ধকার থাকা অলক্ষণ। মিসির আলি লক্ষণ-অলক্ষণ বিচার করে চলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠতে তাঁর আলস্য লাগছে বলে। ঘরে বাতি জ্বালানো হয় নি। তিনি খানিকটা অস্বস্তির মধ্যেও আছেন। তার সামনে যে-তরুণী বসে আছে, অস্বস্তি তাকে নিয়েই। আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা। এতক্ষণ সে বোরকার ভেতর থেকে কথা বলছিল, কিছুক্ষণ আগে মুখের সামনের পরদা তুলে দিয়েছে। মিসির আলি ধাক্কার মতো খেয়েছেন। এমন রূপবতী মেয়ে তিনি খুব বেশি দেখেছেন বলে মনে করতে পারছেন না।

লম্বাটে মুখ। খাড়া নাক। লিপস্টিকের বিজ্ঞাপন হতে পারে এরকম পাতলা ঠোঁট! বড় বড় চোখ; চোখের পল্লব দীর্ঘ। তবে এই দীর্ঘ পল্লব নকলও হতে পারে। এখনকার মেয়েরা নকল পল্লব চোখে পরে। বরফি কাটা চিবুক। চিবুকে লাল তিল দেখা যাচ্ছে। এই তিলও মনে হয় নকল।

আমার নাম সায়রা। সায়রা বানু।

মিসির আলি মনে-মনে কয়েকবার বললেন–সায়রা, সায়রা। তীর ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। কেন তিনি মনে-মনে মেয়েটির নাম নিলেন তা বুঝতে পারলেন না। তিনি কি মেয়েটির নাম মনে রাখার চেষ্টা করছেন? এই কাজটি তিনি কেন করলেন? মেয়েটির অস্বাভাবিক রূপ দেখে? একটি কুরূপা মেয়ে যদি তার নাম বলত তিনি কি মনে-মনে তার নাম জপতেন?

সায়রা, তুমি কি রোজা রেখেছ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইফতারের সময় হবে। আমার এখানে ইফতারের ব্যবস্থা নেই।

পানি তো আছে। এক প্লাস পানি নিশ্চয়ই দিতে পারবেন।

বলতে-বলতে মেয়েটি হাসল। রূপবতী মেয়েদের হাসি বেশিরভাগ সময়ই সুন্দর হয় না। দেখা যায়। তাদের দাঁত খারাপ। কিংবা হাসির সময় দাঁতের মাড়ি বের হয়ে আসে। দীত-মাড়ি ঠিক থাকলে হাসির শব্দ হয় কুৎসিত-হায়না। টাইপ। প্রকৃতি কাউকে সবকিছু দেয় না। কিন্তু সায়রা নামের মেয়েটিকে দিয়েছে। মেয়েটির হাসি সুন্দর। হাসি শেষ হবার পরেও মেয়েটির চোখ সেই হাসি ধরে রেখেছে। এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

মিসির আলি বিব্রত বোধ করছেন। মেয়েটি সারাদিন রোজা রেখেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাগরিবের আজান হবে। মেয়েটি রোজা ভাঙবে। ঘরে পানি ছাড়া কিছুই নেই।

আমি কি আপনাকে চাচা ডাকতে পারি?

পার।

চাচা, আমার ইফতার নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার ইফতারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কীভাবে হবে?

আমি অনেকবার লক্ষ করেছি। রোজার সময় আমি যখন বাইরে থাকি তখন কেউনা-কেউ আমার জন্য ইফতার নিয়ে আসে। চিনি না জানি না। এমন কেউ।

যুক্তিহীন কথা বলেছ।

সায়রা হাসিমুখে বলল, আমি বিশ্বাসের কথা বলেছি, যুক্তির কথা বলি নি।

আমি বরং কিছু ইফতার কিনে নিয়ে আসি?

না, আপনি যেভাবে বসে আছেন বসে থাকুন। আপনার ঘরে কি জায়নামাজ আছে? আমি রোজা ভেঙেই নামাজ পড়ি।

জায়নামাজ নেই।

মিসির আলি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটি এখন সামান্য দুলছে। যেচেয়ারে সে বসে আছে সেটা কাঠের একটা চেয়ার। রকিং-চেয়ার না। মেয়েটির দুলুনি দেখে মনে

হচ্ছে সে রকিং-চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। কিশোরী মেয়েদের চেয়ারে বসে। দুলুনি মানানসই, এই মেয়েটির জন্য মানানসই না।

সায়রা!

জি।

তুমি কী জন্য আমার কাছে এসেছ সেটা এখনো বলো নি।

বলব। রোজা ভাঙার পর বলব।

আমি যদি সিগারেট ধরাই তোমার সমস্যা হবে?

জি না।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, সূর্য উদয় থেকে সূর্যস্ত পর্যন্ত রোজা রাখার নিয়ম। তুমি যদি তুন্দ্রা অঞ্চলে যাও তখন রোজা রাখবে কীভাবে? সেখানে তো ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত।

সায়রা বলল, চাচা, আমি তো তুন্দ্রা অঞ্চলে যাই নি। যখন যাব তখন দেখা যাবে। আপনার কি চা খেতে ইচ্ছা করছে? আপনাকে এক কাপ চা বানিয়ে দিই? যারা প্রচুর সিগারেট খায় তারা সিগারেটের সঙ্গে চা খেতে পছন্দ করে। এইজন্য বললাম। আপনি চা খেতে চাইলে আমি আপনার জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আসতে পারি।

মেয়েটি মিসির আলির অনুমতির জন্য অপেক্ষা করল না। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনার রান্নাঘর কোনদিকে?

মিসির আলি অতিদ্রুত কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে বিষয়টা তাকে সাহায্য করল তা হচ্ছে-মেয়েটি রান্নাঘরে গেল খালি পায়ে। স্যান্ডেল চেয়ারের পাশে পড়ে থাকল। তার অর্থ নিজ-বাড়িতে মেয়েটি খালি পায়ে হাঁটাহাটি করে। এই বাড়িতেও সে পুরোনো অভ্যাসবশত খালি পায়ে রান্নাঘরে গেছে। যে-বাড়িতে এই মেয়ে খালি পায়ে হাঁটে সে বাড়ির মেঝে হতে হবে ঝকঝকে ধূলিশূন্য। মার্বেলের মেঝে কিংবা পুরো বাড়িতে ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট।

মেয়েটি চেয়ারে বসে দোল খাওয়ার ভঙ্গি করছিল। অর্থাৎ মেয়েটির বাড়িতে একটি রকিং-চেয়ার আছে। সে অনেকখানি সময় এই চেয়ারে বসে কাটায়। সেই অভ্যাস রয়ে গেছে!

মেয়েটির নাকে নাকফুল আছে। নাকফুল হীরের। হীরের সাইজ ভালো। সচরাচর মেয়েরা নাকে যেসব হীরের নাকফুল পরে সেই হীরে চোখে দেখা যায় না। ম্যাগনিফাইং গ্লাসে দেখতে হয়।

মেয়েটি যখন উঠে রান্নাঘরে গেল তখন তার গা থেকে হালকা সেন্টের গন্ধ এসেছে। অতি দামি পারফিউম মাঝে মাঝে গন্ধ ছড়ায়। সব সময় ছড়ায় না। মেয়েটি অতি দামি কোনো পারফিউম মেখেছে।

মেয়েটি আপনার রান্নাঘর কোথায় বলেই রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছে। রান্নাঘরে যাবার অনুমতি চায় নি। এর অর্থ, এই মেয়ে অনুমতি নিয়ে কোনোকিছু করায় অভ্যস্ত না। যে-বাড়িতে সায়রা বাস করে সেই বাড়ির কর্ত্রী সে নিজে।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। অনেকগুলো ছোট-ছোট সিদ্ধান্ত থেকে একটা বড় সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সেটা কোনো জটিল কাজ না।

সায়রা নামের মেয়েটি অতি ধনবান গোত্রের একজন। সে গাড়ি ছাড়া আসবে না। সে অবশ্যই গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাড়ি কাছেই কোথাও অপেক্ষা করছে। মেয়েটির ইফতার গাড়িতেই আছে। ইফতারের সময় হলেই গাড়ির ড্রাইভার ইফতার নিয়ে আসবে। এই ব্যাপারে মেয়েটি নিশ্চিত বলেই ইফতারের ব্যাপারে মাথা ঘামায় নি।

চাচা অ্যাপনায় চা।

মিসির আলি চায়ের কাপ হাতে নিলেন। সায়রা বলল, আমি আগামীকাল লোক পাঠাব। সে এসে রান্নাঘর পরিষ্কার করে দেবে। আমি আমার জীবনে এমন নোংরা। রান্নাঘর দেখি নি।

সায়রা আগের জায়গায় বসল। হাতঘড়িতে সময় দেখল। মিসির আলি বললেন, ইফতারের সময় হলেই তোমার ড্রাইভার ইফতার দিয়ে যাবে—আমার এই অনুমান কি ঠিক আছে?

সায়রা বলল, ঠিক আছে। মিসির আলি বললেন, তুমি তোমার বাড়িতে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা রকিৎ-চেয়ারে বসে দোল খাও আমার এই অনুমান কি ঠিক আছে?

হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনাকে আমি যত বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম। আপনার বুদ্ধি তারচেয়ে বেশি। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। আমি আপনাকে দয়া করতে বলছি না। আমি আল্লাহ্‌পাকের দয়া ছাড়া কারোর দয়া নিই না। আপনার কাজের জন্য আমি যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেব।

তুমি আল্লাহপাকের দয়া ছাড়া কারো দয়া নাও না?

জি না।

আল্লাহপাক তো সরাসরি দয়া করেন না। তিনি কারো-না-কারো মাধ্যমে দয়া করেন। তুমি অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যাও। তার সেবা তোমাকে নিতে হয়।

আপনি তর্ক খুব ভালো পারেন। আমি আপনার সঙ্গে তর্কে যাব না। আমার মূল কথা হচ্ছে, আপনাকে যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

যোগ্য পারিশ্রমিকটা কী?

উত্তরায় ২৪ শ স্কয়ার ফিটের আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। ফোর বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট। আমি অ্যাপার্টমেন্টটা আপনাকে দিয়ে দেব।

মিসির আলি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটিও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। চোখে চোখ রাখার খেলা মেয়েরা খুব ভালো পারে।

সায়রা বানুর ড্রাইভার ইফতার নিয়ে এসেছে। সে সঙ্গে করে জায়নামাজও এনেছে। টেবিলে সে দুটা চায়ের কাপ এবং ফ্লাঙ্ক রাখল। ফ্লাস্কে নিশ্চয়ই চা আছে। গোছানো ব্যবস্থা।

আজান হয়েছে। মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে মেয়েটির রোজা ভাঙার দৃশ্য দেখলেন। এক গ্রাস পানি খেয়ে সে রোজা ভেঙেই জায়নামাজ নিয়ে বসল। অপরিচিত জায়গায় কেউ নামাজ পড়তে চাইলে প্রথমেই পশ্চিম কোন দিকে জেনে নেয়। সায়রা তা করে নি। তার পরেও পশ্চিমমুখী করে জায়নামাজ পেতেছে। এর অর্থ সে আজ প্রথম এখানে আসে নি। আগেও এসেছে, খোঁজখবর নিয়েছে।

মেয়েটির আচার-আচরণে কোনো জড়তা নেই, অস্পষ্টতা নেই। সে নিজে কী করছে তা জানে। নিজের ওপর তার বিশ্বাস প্রবল। এই বিশ্বাস সে অর্জন করেছে তা মনে হচ্ছে না; বিশ্বাসটা সে মনে হয় জন্মসূত্রেই নিয়ে এসেছে।

সায়রার হাতে চায়ের কাপ। সে আগ্রহ নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। মিসির আলি সিগারেট ধরিয়েছেন।

সায়রা বলল, চাচা, আপনি কি আমার প্রস্তাবে রাজি?

মিসির আলি বললেন, কোন প্রস্তাব? সমস্যার সমাধান করব, বিনিময়ে বাড়ি?

হুঁ।

তোমার জানা উচিত সমস্যা সমাধান আমার পেশা না। তা ছাড়া সমস্যার সমাধান আমি সেইভাবে করতেও পারি না। জগতের বড় বড় রহস্যের বেশিরভাগ থাকে অমীমাংসিত। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে। রহস্যের মীমাংসা তেমন পছন্দ করে না।

সায়রা শান্ত গলায় বলল, প্রকৃতি রহস্যের মীমাংসা পছন্দ করুক বা না করুক আপনি মীমাংসা পছন্দ করেন। আমি আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এ সছি। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

কেন সাহায্য করব?

আপনি আপনার নিজের অ্যানন্দের জন্য করবেন। সমস্যা সমাধান করে আপনি আনন্দ পান। সমস্যা যত বড় আপনার আনন্দও হয় তত বেশি। এখন আপনার কিছুই করার নেই। আপনি সময় কাটান শুয়ে-বসে, বই পড়ে এবং সস্তার সিগারেট টেনে! মানুষের জীবন যতটা একঘেয়ে হওয়া উচিত আপনার জীবন ততটাই একঘেয়ে। আপনি কিছুক্ষণের জন্য হলেও সেই একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি পাবেন। তার মূল্যও কি কম? বলুন কম?

না, কম না।

আপনি জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছেন। সস্তার একটা ভাড়া বাড়িতে বাস করেন। একটা মাত্র কামরা। ঘরে নিশ্চয়ই এসি নেই। গরমে কষ্ট পান! শীতের সময় বরফের মতো ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করতে হয়। এখন যদি আপনার চমৎকার একটা ফ্ল্যাট থাকে যে-ফ্ল্যাটে এসি আছে, বাথরুমে গিজার আছে তা হলে ভালো হয় না?

আমি যে-জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আমার জন্য সেটাই ভালো। ঠিক আছে বাদ দিলাম। আপনার যদি আমার মতো একটা মেয়ে থাকত সেই মেয়ে যদি কাঁদতে-কাঁদতে আপনাকে সমস্যার কথা বলত। আপনি কী করতেন?

তুমি কিন্তু কাঁদছ না।

আপনি বললে আমি কাঁদতে পারি। আমি অতি দ্রুত চোখে পানি আনতে পারি। কেঁদে দেখাব?

বলে তোমার সমস্যা।

সায়রা বলল, থ্যাংক য়্যু স্যার। বলেই সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। এর মধ্যেই সে চোখে পানি নিয়ে এসেছে। মিসির আলি মেয়েটির কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হলেন।

সায়রা বলল, পুরোটা আমি লিখে এনেছি। আপনার কাছে খাতাটা রেখে যাচ্ছি। খাতায় আমার টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে। যখন পড়া শেষ হবে আমাকে টেলিফোন করবেন। আমি চলে আসব। আবার যদি পড়তে-পড়তে আপনার খটকা লাগে তা হলেও নিজে এসে খটকা দূর করব।

সায়রার ড্রাইভার এসেছে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে। সায়রা বলল, কাপ দুটা থাকুক। এই বাড়িতে ভালো কাপ নেই! আবার যখন আসব-এই কাপে চা খাব।

মিসির আলি খাতাটা হাতে নিলেন। প্রায় এক শ পৃষ্ঠা গুটিগুটি করে লেখা। পুরোটাই ইংরেজিতে। শিরোনাম—

Autobiography of an unknown young girl.

সায়রা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, লেখাটার টাইতেল আমি একজনের কাছ থেকে নকল করেছি। নীরদ সি চৌধুরীর একটা বই আছে, নাম–

Autobiography of an unknown Indian. সেখান থেকে নেওয়া।

মিসির আলি বললেন, তোমার পড়াশোনার সাবজেক্ট কি ইংরেজি?

জি না। কেমিষ্ট্রি। আমি স্কটল্যান্ডের এবারডিন ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রিতে পিএইচ. ডি. করেছি। বুঝতে পারছি আপনি ছোটখাটো ধাক্কার মতো খেয়েছেন। আপনি আমাকে অনেক অল্পবয়সি মেয়ে ভেবেছিলেন; আমার বয়স ত্রিশ। এখন আপনাকে আরেকটা ছোট্ট ধাক্কা দিতে চাই। দেব?

দাও।

আমি একটা সিগারেট খাব। আপনি যদি অনুমতি দেন।

অনুমতি দিলাম।

সায়রা তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে সিগারেট বের করল। লাইটার বের করল। খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাল।

মিসির আলি তেমন কোনো ধাক্কা খেলেন না। মেয়েটা ধূমপানে অভ্যস্ত না। এই কাজটা যে সে তাকে চমকে দেবার জন্য করেছে তা বোঝা যাচ্ছে। সিগারেটের প্যাকেটটা নতুন। লাইটার ধরাবার কায়দাও সে জানে না। সিগারেটের ধোয়া ফুসফুসে নিয়ে সে কাশছে। চোখের মণি লাল হয়ে গেছে।

আপনি কি আমার সিগারেট খাওয়া দেখে রাগ করছেন?

না।

বিরক্ত হচ্ছেন?

না।

প্লিজ রাগ করবেন না। বিরক্তও হবেন না। সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার আমি আপনার জন্য এনেছি। হঠাৎ কেন জানি ইচ্ছা হল আপনাকে আরেকটু চমকাই! চাচা এখন আমি যাই?

যাও!

আপনি কিন্তু খাতাটা আজ রাতেই পড়তে শুরু করবেন।

মিসির আলি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

যাই বলেও সায়রা দাঁড়িয়ে আছে। যাচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, তুমি কি আরো কিছু বলবে?

সায়রা বলল, আমি আপনাকে যেরকম ভেবেছিলাম আপনি সেরকম না।

মিসির আলি বললেন, কীরকম ভেবেছিলে?

অহংকারী, রাগী। আমি চিন্তাই করি নি। আপনি এত সহজে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবেন। থ্যাংক য়্যু।

২. সায়রার লেখা অটোবায়োগ্রাফির সরল বঙ্গানুবাদ

সায়রার লেখা অটোবায়োগ্রাফির সরল বঙ্গানুবাদ

বাবা আমার নাম রেখেছিলেন মিথেন। আমার নাম মিথেন, আমার ছোট বোনের নাম ইথেন।

ছোটবেলায় কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে মজার ব্যাপার হত। প্রশ্ন কর্তা নাম শুনে অবাক হয়ে বলত–এমন নাম তো শুনি নি! এর অর্থ কী?

আমি বলতাম মিথেন হল হাইড্রোকার্বন। এর কেমিক্যাল ফর্মুলা CH4, আমার ছোট বোনের নাম ইথেন। ইথেনের কেমিক্যাল ফর্মুলা হল CH3 – CH3

প্রশ্নকর্তা আরো অবাক হয়ে বলত, এমন অদ্ভুত নাম কে রেখেছে?

আমি বলতাম, বাবা। তিনি কেমিস্ট্রির টিচার।

আমার বাবার নাম হাবিবুর রহমান। ছোটখাটো মানুষ। কুঁজো হয়ে হাঁটতেন যখন তখন তাকে আরো ছোট দেখাত। কলেজের ছাত্ররা তাকে ডাকত। ট্যাবলেট স্যার। আমার ছোট বোন ইথেন ছিল ফাজিল স্বভাবের মেয়ে। সে একদিন বাবাকে ট্যাবলেট বাবা ডেকে

ফেলেছিল। বাবা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর ছোট মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন– এটা কী বললা গো মা?

ইথেন বলল, আর কোনোদিন বলব না বাবা। এই বলেই সে কাঁদতে শুরু করল। বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে কান্না বন্ধ করলেন।

আমার ট্যাবলেট বাবা মানুষ হিসেবে ভালো ছিলেন। শুধু ভালো না একটু বেশিরকম ভালো। তিনি আমাদের দুই বোনকে খুবই আদর করতেন। কিছু-কিছু মানুষ আদর স্নেহ ভালবাসা এইসব মহৎ গুণ নিয়ে জন্মায় কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। বাবা ছিলেন সেই দলের। মার মৃত্যুর পর বাবা আর বিয়ে করেন নি কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল সৎমায়ের সংসারে আমরা দুই বোন কষ্ট পাব।

ধর্মকর্মের প্রতি বাবার কোনো ঝোঁক আগে ছিল না। মার মৃত্যুর পর তিনি এইদিকে ঝুকে পড়েন। নামাজ, নফল রোজা, গভীর রাতে জিগির এইসব চলতে থাকে। তিনি দাড়ি রাখলেন, চোখে সুরমা দেওয়া শুরু করলেন। কলেজের ছাত্ররা তাঁর নতুন নামকরণ করল ট্যাবলেট হুজুর।

অতিরিক্ত ধর্মকর্মই সম্ভবত বাবার মধ্যে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এল—তিনি শুচিবায়ু রোগে পড়লেন। অজু করার পরপরই তাঁর মনে হত যে—বদনায় তিনি অজু করেছেন সেই বদনা নাপাক। কাজেই বদনা ধুয়ে আবার নতুন করে অজু। শুচিবায়ু খুব খারাপ রোগ–এই রোগ কখনো স্থির থাকে না, বাড়তে থাকে। বাবার এই রোগ বাড়তে থাকল। তার সঙ্গে যুক্ত হল ইবলিশ শয়তান-দেখা রোগ। তিনি মাঝে মধ্যেই আমাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে

ইবলিশ শয়তানকে দেখতে শুরু করলেন। ইবলিশ শয়তান নাকি নিজ দায়িত্বে এই বাড়িতে এসে উঠেছে। তার একটাই কাজ-বাবাকে ধর্মের পথ থেকে সরিয়ে আনা।

একদিনের কথা। বাবা মাগরিবের নামাজের পর আমাদের দুই বোনকে ডেকে পাঠালেন। আমরা অবাকই হলাম, কারণ মাগরিব থেকে এশ পর্যন্ত বাবা কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। জায়নামাজে বসে তসবি টানতেন।

আমরা বাবার সামনে বসলাম। তিনি জায়নামাজে বসে আছেন। আমরা বসেছি জয়নামাজ থেকে একটু দূরের পাটিতে। দরজা-জানালা বন্ধ। ঘর অন্ধকার। বাবার সামনে আগরদানে আগরবাতি জ্বলছে। বাবা বললেন, মাগো তোমাদের একটা বিশেষ কারণে ডেকেছি। কারণটা মন দিয়ে শোন। ইবলিশ স্বয়ং এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, তার বিষয়ে সাবধান। আমি কয়েকবারই তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। তোমরাও নিশ্চয়ই পাবে। যাতে তোমরা ভয় না পাও এইজন্য আগেভাগে সাবধান করলাম।

ইথেন বলল, বাবা, ইবলিশের দেখা যদি পাই তা হলে তাকে কী ডাকবা? ইবলিশ ভাই?

বাবা হতভম্ব হয়ে ইথেনের দিকে তাকালেন। ইথেন সহজভাবে তাকিয়ে রইল। বাবা বললেন, মাগো, তুমি কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস টেনে উঠেছি।

যে-মেয়ে ক্লাস টেনে উঠেছে সে তো মাশাল্লা অনেক বড় মেয়ে। তার কি উচিত। সব সময় ঠাট্টা-ফাজলামি ধরনের কথা বলা?

উচিত না বাবা।

বাবা বললেন, ইবলিশ শয়তান যে এই বাড়িতে আছে আমার এই কথাটা তোমরা গুরুত্বের সঙ্গে নাও। এর ক্ষমতা অনেক বেশি বলেই আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং তার বিষয়ে বারবার সাবধান করেছেন। মা ইথেন তুমি কি জান ইবলিশ কে?

জানি। সে শুরুতে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র ছিল। একজন বড় ফেরেশতা।

তোমার জানায় সামান্য ভুল আছে। ইবলিশ ফেরেশতা না। সে জিন সম্প্রদায়ের। জিন সম্প্রদায় মানব সম্প্রদায়ের কাছাকাছি-এদের জন্ম-মৃত্যু আছে। তবে ইবলিশের মৃত্যু হবে কেয়ামতের সময়। তার আগে না।

ইথেন আবারো বেফাঁস কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি তাকে ইশারায় থামালাম। বাবা বললেন, আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে। শয়তান চলে মানুষের শিরায়-শিরায়। তারা মানুষের সবচেয়ে দুর্বল অংশে আঘাত করে! আমাকে শয়তান কিছু করতে পারছে না। কাজেই সে তোমাদের মাধ্যমে আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। কারণ আমি তোমাদের অত্যন্ত স্নেহ করি। জুলাস মানুষের দুর্বল স্থান। কাজেই ইংলিশ আঘাত করবে স্নেহ-ভালবাসার দুর্বল স্থানে।

বাবার কথা শেষ হবার আগেই ইথেন বলল, বাবা আমি উঠি? আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

কী কাজ?

টিভিতে x-Fite নামে একটা শো হয়। আমি তার কোনোটাই মিস করি নি। আজকেরটাও করব না।

x-File-এ কী দেখায়?

ভূতপ্রেত সুপার ন্যাচারাল এইসব হাবিজাবি।

হাবিজাবি দেখার দরকার কী?

হাবিজাবি আমার ভালো লাগে বাবা! কী করব বলে, আমি মেয়েটাই মনে হয়। হাবিজাবি।

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, আচ্ছা যাও।

ইথেন তৎক্ষণাৎ উঠে চলে গেল। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে মা, তুমিও যাও।

হাবিজাবির দিকে ইথেন খুবই ঝুঁকে পড়েছিল। সে সিগারেট খাওয়া ধরেছিল। রাতে ঘুমাতে যাবার সময় সে তার ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করে প্রথমেই আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলত-আপা খাবি? একটা টান দিয়ে দ্যাখ না? এমনভাবে তাকাচ্ছিস কেন? ছেলেরা যে-জিনিস খেতে পারে মেয়েরাও পারে। তোর ইচ্ছা হলে বাবাকে বলে দে। যা, এখনই গিয়ে বল। আমি কোনোকিছু কেয়ার করি না। বাবা কী করবে, আমাকে মারবে? মারলে মারুক।

সে যে কোনো কিছুই কেয়ার করে না তার প্রমাণ কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। এক রাতে সে তার ব্যাগ থেকে কোকের ক্যানের মতো ক্যান বের করে বলল, আপা এক চুমুক খেয়ে দেখাবি?

আমি বললাম, কী?

বিয়ার। সামান্য অ্যালকোহল আছে। সেটা না-থাকার মতো।

তুই বিয়ার খাচ্ছিস?

হুঁ। অসুবিধা কী? রোজ তো খাচ্ছি না। এক দিন একটু চেখে দেখব। ইউরোপ আমেরিকায় আমার বয়সি মেয়েরা পানি খায় না। বিয়ার খায়।

বিয়ার তোকে কে দিয়েছে?

দিয়েছে একজন। নাম দিয়ে কী করবি?

আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে তার বিছানায় পা বুলিয়ে বসেছে। বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিচ্ছে, পা দোলাচ্ছে। তার মুখ হাসি-হাসি। আমি মনে-মনে ভাবলাম বাবার কথাই মনে হয় ঠিক। আমাদের দুই বোনের মধ্যে দিয়ে শয়তান কাজ করতে শুরু করেছে।

আমার উচিত ছিল ইথেনের কর্মকাণ্ড বাবাকে জানানো। আমি তা জানালাম না। এখানেও হয়তো শয়তানের কোনো হাত আছে।

এর মাসছয়েক পরের কথা। বর্ষাকাল। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। আমরা দুই বোন ছাদে বৃষ্টির পানিতে গোসল সেরে ফিরেছি। ইথেন আমাকে বলল, আপা, আমার যদি কোনো মেয়ে হয় তার নাম কী হওয়া উচিত? কেমিস্ট্রি নাম। প্রপেন নামটা তোর পছন্দ হয়? ছেলে হলেই-বা কী নাম হবে? তুই যা তো, বাবার কাছ থেকে জেনে আয়।

আমি বললাম, বিয়ে হোক। ছেলেমেয়ে হোক তখন বাবার কাছ থেকে জানব।

আমার এখনই জানা উচিত।

এখনই জানা উচিত কেন?

ইথেন বলল, এখনই জানা উচিত। কারণ আমার পেটে বাচ্চা।

আমি বললাম, ফাজলামি করিস না।

ইথেন বলল, ফাজলামি করছি না। যা বাবাকে গিয়ে বল। এক্ষুনি বল।

আমি বললাম, ইথেন সবকিছুর সীমা আছে।

ইথেন বলল, সবকিছুর সীমা আছে তোকে কে বলল? মহাকাশের সীমা নেই। মানুষের ভালবাসার সীমা নেই। ঘৃণার সীমা নেই। অহংকারের সীমা নেই।

চুপ।

আমি চুপ করব না। আপা আমি নাম চাই। বাবা যদি নাম না দেন তা হলে আমি ইবলিশের কাছে নাম চাইব। সেটা কি ভালো হবে? ইবলিশ নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে যদি নাম দেয় কিবলিশ সেটা ভালো হবে? লোকে হাসবে না?

৩. বাবার ঘর অন্ধকার

বাবার ঘর অন্ধকার। দরজা-জানালা বন্ধ। ঘরের বাতি নেভানো। তবে জায়নামাজের পাশে মোমবাতি জ্বলছে। ঘরে আগরবাতির গন্ধ। আগরবাতি দেখা যাচ্ছে না। তবে জ্বলছে নিশ্চয়ই। তিনি মোমবাতির দিকে পেছন ফিরে তসবি টানছিলেন। আমি তার সামনে বসতেই তিনি আমার দিকে ফিরলেন। পেছন থেকে মোমবাতি এনে দুজনের সামনে রাখতে–রাখতে বললেন, যে জটিল কথাটা বলতে এসেছিস বলে ফেল। কী বলবি সেটা মনে হয় আমি জানি। মোমবাতির আলোতে বলতে অসুবিধা হলে মোমবাতি নিভিয়ে দিই।

আমি বললাম, বাতি নেভাতে হবে না। বাবা তসবি টানা বন্ধ করলেন না। আমার দিকে তাকালেনও না। তিনি তাকিয়ে রইলেন মোমবাতির দিকে। আমি কথা শেষ করলাম। তাঁর চেহারায়, চোখ-মুখের ভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন হল না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, মা, দেখি আতরের শিশিটা এনে দাও তো।

নিজের মেয়ে সম্পর্কে এমন ভয়াবহ কথা শোনার পর পৃথিবীর কোনো বাবা বলতে পারেন না-আতারের শিশিট দেখি।

গায়ে আন্তর মাখা তিনি সম্প্রতি শুরু করেছেন। এক সুফি মানুষ নাকি মেশকে আম্বর নামের এই শিশি দিয়েছেন। আতরের বৈশিষ্ট্য হল গন্ধ অতি কড়া, তবে কড়া গন্ধে মাথা ধরে না।

আমি বললাম, বাবা সত্যি আন্তর এনে দেব?

বাবা বললেন, হুঁ। ইবলিশ শয়তান সুগন্ধি সহ্য করতে পারে না। তার পছন্দ সালফার-পোড়া দুর্গন্ধ, সব সময় গায়ে আতর মাখবি।

আমি আতরদানি এনে বাবার সামনে রাখলাম। তিনি অনেক আয়োজন করে আন্তর দিলেন। প্রথমে তুলায় আন্তর মাখলেন। সেই তুলা হাতে ঘষলেন, নাকে ঘষলেন, শেষ পর্যায়ে কানোর ভাঁজে রেখে দিলেন।

আমি বললাম, তুমি কি ইথেন বিষয়ে কিছু বলবে? নাকি আমি চলে যাব? তুমি আরো চিন্তাভাবনা করবে?

বাবা বললেন, আমার মেয়েটির কোনো দোষ নাইরে মা। সব শয়তান করাচ্ছে। তাকে শয়তানের হাত থেকে বাচাতে হবে। প্রথম যে-কাজটা করতে হবে তার কাছে যেন শয়তান যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। তাকে পাক-পবিত্র থাকতে হবে। নাপাক শরীর শয়তানের পছন্দ। তার গায়ে সুগন্ধি থাকতে হবে। সে আতর মাখবে বলে মনে হয় না। তাকে সেন্ট মাখতে হবে। তাকে...

আমি বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, বাবা তুমি মনে হয় মূল বিষয়টা ধরতে পারছ না। ইথেন বলছে–তার পেটে বাচ্চা। এটার কী করবে?

বাবা বললেন, আমার কী করা উচিত?

আমি বললাম, আমি তো বুঝতে পারছি না। বাবা! বিষয়টা আমার জন্য জটিল।

বাবা বললেন, যে-ছেলের কারণে ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে ইথেনের বিবাহ দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ। যে-ছেলের কারণে ঘটনা ঘটেছে তার নাম-ঠিকানা এনে দে। আমি তাকে রাজি করব। প্রয়োজনে তার পায়ে ধরব।

আমি বললাম, যে-ছেলে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে সে তো খারাপ ছেলে। তুমি তার সঙ্গে ইথেনের বিয়ে দেবে?

হ্যাঁ দেব। এতে ইথেনের সম্মান রক্ষা হবে। সম্মান অনেক বড় জিনিসরে মা। তুই ছেলেটার নাম-ঠিকানা এনে দে। আর শোন মা, আজ রাতে আমি কিছু খাব না। উপোস দেব। সারা রাত উপোস নিয়ে আল্লাহপাকের নাম জিগির করব।

বাবা মোমবাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিলেন। আমি গেলাম ইথেনের কাছে।

ইথেন খুবই স্বাভাবিক। কিটক্যাট চকোলেটের একটা প্যাকেট তার হাতে। সে খাটে বসে পা দোলাচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতেই সে বলল, আজ রাতে HBo-তে ভালো মুভি আছে আপা, দেখবি? Silence of the Lambs.

আমি বললাম, মুভি দেখব না। তোর সঙ্গে কথা আছে।

মুভি দেখার ফাঁকে-ফাকে কথা বলব। যখন অ্যাড হবে তখন কথা বলব। আপা চকোলেট খাবি?

আমি বললাম, বাবা ছেলেটার নাম-ঠিকানা চাচ্ছে।

কোন ছেলেটার?

যে-ছেলেটার সঙ্গে কাণ্ড ঘটিয়েছিস।

কী কাণ্ড ঘটিয়েছি?

আমার সঙ্গে ফাজলামি করিস না। তুই জানিস তুই কী ঘটিয়েছিস।

ইথেন হেসে ফেলল। হাসাতে-হাসতে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে এমন অবস্থা। আমি বললাম, হাসছিস কেন?

ইথেন বলল, তোকে বোকা বানিয়ে খুব মজা পেয়েছি। এই জন্য হাসছি। মন দিয়ে শোন, আমার কিছুই হয় নি। কারো সঙ্গে কিছু ঘটে নি। আমার ভয়ংকর কথা শুনে তুই কী করিস, বাবার কী রিঅ্যাকশান হয় এটা দেখার জন্যই আমি গল্প বানিয়েছি।

গল্প বানিয়েছিস?

হুঁ। ভালো কথা, আমাদের হুজুর তোর কাছে সব শুনে কী করল, মাথা ঘুরে পড়ে গেল?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। ইথেন বলল, আপা এখন বল, ছবি দেখবি?

হ্যাঁ, দেখতে পারি।

থ্যাংক য়্যু। ভয়ের ছবি একা দেখে মজা নেই। ভয়ের ছবি সব সময় দুজন মিলে দেখতে হয়। হাসির ছবি দেখতে হয় চার-পাঁচ জন মিলে–ভয়ের ছবি শুধু দুই জন। আমি বললাম, তুই যে মিথ্যামিথ্যি ভয় দেখিয়েছিস এটা বাবাকে বলে আসি?

যা বলে আয়। আনন্দসংবাদ শুনে ট্যাবলেট হুজুর কী করে কে জানে। আমি বাবার ঘরে ঢুকলাম। মোমবাতি জ্বালিয়ে বাবার পাশে বসলাম। দেখলাম বাবার মুখ ছাইবর্ণ। কপালে ঘাম। তিনি সামান্য কাঁপছেন। তাঁর ঠোঁট নড়ছে। নিশ্চয়ই কোনো দোয়াদরূদ পড়ছেন। তিনি ইশারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বললেন। তিনি বড় কোনো দোয়ার মাঝখানে আছেন। দোয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কারো কথা শুনবেন না।

আমি অপেক্ষা করে আছি। একসময় তার দোয়া শেষ হল। তিনি আমার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, মা, ইবলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ইবলিশ আমাকে বলেছে-তোমার মেয়ে বিষয়টা অস্বীকার করবে। ভাব করবে। ঠাট্টা। কিন্তু ঘটনা সত্য।

ইবলিশের সঙ্গে তোমার কখন কথা হয়েছে?

তুমি আমার এখান থেকে যাওয়ার পরেই। ইথেন কি তোমাকে এরকম কিছু বলেছে?

হুঁ।

তার কথা বিশ্বাস করবে না।

আমি বললাম, তার কথা বিশ্বাস করব না, ইবলিশ শয়তানের কথা বিশ্বাস করব?

বাবা বললেন, এই ক্ষেত্রে করবে। শয়তান সব সময় সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশায়। এমনভাবে মিশায় যে সত্য-মিথ্যা আলাদা করা যায় না।

আমি বললাম, মানুষও তো সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশায়।

বাবা বললেন, মানুষের মিশ্রণ ভালো হয় না। মানুষের মিশ্রণ হয় তেল-জলের মিশ্রণ। কিছুক্ষণ পরেই তেল-জল আলাদা হয়ে যায়। আর শয়তানের মিথ্যা হল দুধপানির মিশ্রণ, আলাদা করা যায় না।

আমি বললাম, এক ফোটা লেবুর রস দিলে দুধ-পানি আলাদা হয়ে যায়।

বাবা বললেন, সেই লেবুর পানি সবার কাছে থাকে না মা! এই বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আর তর্ক করব না। তর্ক করার মতো মানসিক অবস্থা আমার না। তুমি এখন যাও। বোনের সঙ্গে তোমার ছবি দেখার কথা, ছবি দেখ।

ছবি দেখার কথাও কি ইবলিশ শয়তান আপনাকে বলেছে?

হ্যাঁ।

কী ছবি দেখব, সেটা বলেছে? ছবির নাম?

ছবির নাম বলে নাই, শুধু বলেছে ভয়ের ছবি।

আমি বাবার সামনে থেকে উঠে গেলাম, বাবা ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন।

আমরা রাত দুটা পর্যন্ত ছবি দেখলাম। ছবি শেষ করে খেতে গেলাম। খাবার টেবিলে খাবার সাজিয়ে বাবাকে ডাকতে গোলাম, তিনি যদি মত বদলে খেতে আসেন। বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। দরজায় অনেকবার ধাক্কা দেবার পরও তিনি দরজা খুললেন না।

ইথেন কিছু খেতে পারছে না। খাবার নাড়াচাড়া করছে।

আমি বললাম, কী হল, খাবি না?

ইথেন বলল, বমি-বমি আসছে আপা। এখন আমার খাবারের গন্ধ নাকে এলেই বমি আসে।

আমি তাকিয়ে আছি। ইথেন খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ল। তবে চলে গেল না। চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, আর কিছু বলবি?

ইথেন বলল, হুঁ। ছবি শুরু হবার আগে যে-ঘটনাকে আমি ঠাট্টা বলেছিলাম তা ঠাট্টা না। ঘটনা সত্যি। আমার পেটে বাচ্চা আছে। ফার্মেসি থেকে প্রোগনেসি টেষ্টের কিট এনে প্রোগনেন্সি টেস্ট করিয়েছি। টেস্ট পজিটিভ। সুন্দর রিং হয়।

আমি কিছুই বলছি না, তাকিয়ে আছি। আমার চোখে ভয় না বিস্ময় কী ছিল তা জানি না, তবে ইথেনের চোখে এই প্রথম দেখলাম হতাশা।

ইথেন বলল, আমি জানি তোমরা চাইবে ঐ ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে। সেটা সম্ভব না।

আমি বললাম, সম্ভব না কেন?

কেন সম্ভব না সেটা তোমাকে বলব না। সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারব না।

এই বলেই ইথেন চলে গেল। হঠাৎ প্রচণ্ড ভয়ে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। আমার কাছে মনে হল ভয়াবহ দুঃসময় আমাদের ওপর চেপে বসতে যাচ্ছে।

(প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত)

মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। সিগারেট ধরলেন। রান্নাঘরে গেলেন। চুলা ধরিয়ে চায়ের কেটলি বসালেন। রাত বেশি হয় নি। নয়টা দশ। সাড়ে নয়টার দিকে হোটেল থেকে খাবার আসবে। দুই পিস রুটি, ভাজি, কোনোদিন ঘন ডাল! কোনোদিন মুরগির মাংস। তাঁর ঘরে কাজের লোক নেই। হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিন বেলাই হোটেল থেকে খাবার আসে। খাবার ভালো। বেশ ভালো। মিসির আলির ধারণা হোটেলওয়ালা তাঁর খাবার আলাদা রান্না করে। তার ধারণার পেছনের কারণ হল রাতের খাবারটা হোটেলের মালিক হারুন বেপারী, হটপটে করে নিজে নিয়ে আসে। খাওয়াদাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকে। মিসির আলির সঙ্গে সে অতি আগ্রহের সঙ্গে নানান বিষয়ে গল্প করে। গল্পের কোনো বিশেষ ধারা নেই। একেক দিন একেকটা! যেমন গতকাল গল্পের বিষয়বস্তু ছিল— সাপের মণি শক্ত না নরম।

মিসির আলি বললেন, সাপের তো মণিই হয় না, শক্ত নরমের প্রশ্ন উঠছে না।

হারুন বেপারী বিস্মিত হয়ে বলল, মিসির আলি সাব, আপনি অনেক জ্ঞানী লোক। তার পরেও সব জ্ঞানী লোক সব বিষয় জানে না। আপনেও জানেন না। সাপের মণি অবশ্যই হয়-আমি নিজ চোখে দেখেছি। এখন বলেন আমি মিথ্যা দেখেছি।

মানুষের দেখার মধ্যেই ভুল থাকে। দড়ি দেখেও অনেকে মনে করে সাপ। এজন্যই বলা হয়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

হারুন বলল, যারা মালটাল খেয়ে হাঁটাইটি করে তারা দড়ি দেখে বলে সাপ। আমি জিন্দেগিতে মাল খাই নাই। কোনোদিন খাবও না ইনশাল্লাহ্। যদি কোনোদিন এক ফোটা মাল খাই আপনার কাছে এসে স্বীকার যাব। আপনি আমাকে পায়ের জুতা দিয়ে দুই গালে দুই বাড়ি দিবেন।

এই ধরনের মানুষের সঙ্গে কোনোরকম তর্কে যাওয়াই বিপজ্জনক। মিসির আলি তর্কে পারতপক্ষে যান না। লোকটি তাকে পছন্দ করে। মাত্রার বেশিই পছন্দ করে। সেই পছন্দকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

হারুন বেপারী গত সপ্তাহে তাঁকে একটা মোবাইল টেলিফোন গিফট করেছে। বাজার থেকে কিনে এনে যে গিফট করেছে তা না। কোনো এক কষ্টমার নাকি মোবাইল টেলিফোন তার দোকানে ফেলে গেছে। সে মোবাইল টেলিফোনের সিম কার্ড ফেলে নতুন সিম কার্ড ভরে উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছে মিসির আলির জন্য।

মিসির আলি বলেছেন, ঐ কাষ্টমার নিশ্চয়ই মোবাইল টেলিফোনের খোঁজে আপনার রেস্টুরেন্টে আসবে।

হারুন বলেছে—সকালে ফালায়ে গেছে-দুপুরে আইস উপস্থিত। আমি বলেছি আমরা কিছু পাই নাই।

কাজটা কি ঠিক হল?

অবশ্যই ঠিক হইছে। তুই সাবধানে চলাফিরা করবি না? যেখানে সেখানে জিনিসপত্র ফালায়া চইল্যা যাবি?

মিসির আলি কাতর গলায় বললেন, ভাই আমি এই টেলিফোন রাখব না।

কেন রাখবেন না? আপনি তো চুরি করেন নাই। আমি আপনারে দিতেছি।

আমার টেলিফোনের দরকার নাই।

অবশ্যই দরকার আছে। এখন মোবাইলের জমান। আমি আপনার ছোট ভাই হিসেবে দিতেছি। আপনের রাখতে হবে।

ঝামেলা এড়াবার জন্য মিসির আলি টেলিফোন রেখে দিয়েছেন। তবে কখনো ব্যবহার করেন নি। ব্যবহার করার আসলেই কোনো প্রয়োজন পড়ে নি।

আজ ইচ্ছা করলে ব্যবহার করা যায়। সায়রা নামের মেয়েটিকে কয়েকটা প্রশ্ন করা সরকার।

১. সায়রার বাবা হাবিবুর রহমান সাহেব এখনো জীবিত কি না।

২. তাদের বাড়িতে দুই বোন এবং বাবা ছাড়া অন্য কেউ থাকে কি না।

৩. সায়রা যে লেখা লিখছে হুবহু সত্য কি না। তার লেখার ভঙ্গি উপন্যাসের ভঙ্গি। উপন্যাস-লেখক সত্য ঘটনা বর্ণনার সময়ও নানান রঙ ব্যবহার করেন। নানান রঙের মিশ্রণ থেকে সাদা-কালো সত্য বের করা বেশ কঠিন হয়ে যায়।

ইবলিশ শয়তান মেয়েদের বাবার সঙ্গে গল্পগুজব করছে, বাবাকে বলছে মেয়েরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভয়ের ছবি দেখবে এটা একেবারেই অসম্ভব। একজন কেউ মিথ্যা বলছে। হয় হাবিবুর রহমান সাহেব বলছেন অথবা সায়রা তার লেখা রহস্যময় করার জন্য বানিয়েছে।

মেয়েদের বাবার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। তিনি কেন ইবলিশকে জিন বলছেন? সুরা বাকারাতে স্পষ্টই ইবলিশকে ফেরেশতা বলা হয়েছে। কোন আয়াতে বলা হয়েছে সেটা মনে নেই। অন্য কোনো আয়াতে কি ইবলিশকে জিন বলা হয়েছে?

ভদ্রলোককে পাওয়া গেলে আরো একটি প্রশ্ন করা যেত। তিনি কেন ইবলিশকে ইবলিশ শয়তান বলছেন? শয়তান শব্দটা এসেছে–শায়াতিন থেকে। শায়াতিন হল ইবলিশদের

নেতা। তিনি কি জেনেশুনেই ইবলিশকে ইবলিশ শয়তান বলছেন নাকি এটা তার কথার কথা। নাকি সায়রার বর্ণনাভঙ্গিতেই ব্যাপারটা এসেছে।

সায়রার বর্ণনাতেও একটা খটকা তৈরি হয়েছে। তিনি মোটামুটি নিশ্চিত সায়রা যে-সময়ের কথা বলছে সে-সময়ে Silence of the Lambs ছবিটি তৈরিই হয় নি।

মিসির আলি ছবি দেখেন না। তাঁর আগের বাড়িওয়ালা জোর করে এই ছবিটি তাকে দেখিয়েছেন কারণ এই ছবিতে একজন সাইকিয়াট্রিষ্টের কথা আছে। বাড়িওয়ালার ধারণা যেহেতু মিসির আলিও এই ধারার মানুষ তার ছবিটা দেখা উচিত।

সায়রা বলে গিয়েছিল কোনো খটকা লাগলে তাকে যেন টেলিফোন করা হয়। মিসির আলির কাছে যে চোরাই মোবাইল টেলিফোন আছে তিনি নীতিগতভাবে সেই টেলিফোন ব্যবহার করতে পারেন না।

Autobiography of an unknown young girl বইটির দ্বিতীয় চ্যাপ্টার পড়াও শুরু করলেন না। প্রথম চ্যাপ্টারের খটকা আগে কাটুক। তিনি অপেক্ষা করছেন সায়রার জন্য।

৪. মধ্যবয়স্ক এক লোক

মধ্যবয়স্ক এক লোক রান্নাঘর ধোয়ামোছা করছে। মিসির আলি ঘর ঝাঁট দেবার শব্দ পাচ্ছেন, পানি ঢালার শব্দ পাচ্ছেন, ফিনাইলের গন্ধ পাচ্ছেন। তাঁর শোবার ঘরেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সব বই সাজিয়ে বুকশেলফে তোলা হয়েছে। বুকশেলফটা নতুন। আগের ভাঙা বেতের বুকশেলফ আপাতত বারান্দায় রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে সেখান থেকে চলে যাবে ডাস্টবিনে।

মিসির আলির খাটের কাছে নতুন একটি সাইডটেবিল দেওয়া হয়েছে। সাইডটেবিলে টেবিলল্যাম্প। টেবিলল্যাম্পের পাশে একটি টেবিলঘড়ি এবং ক্রিস্টালের অ্যাশট্রে।

যে-জায়গায় কয়েকটি কাঠের চেয়ার পেতে বসার ব্যবস্থা ছিল সেখানের পরিবর্তনটা চোখে পড়ার মতো! মেঝেতে কর্পেট বিছানো! দুটা অতি আরামদায়ক গদির চেয়ার। গদির চেয়ার দুটার সামনে একটি দামি রকিং-চেয়ার। এই রকিং-চেয়ারে বর্তমানে দোল খাচ্ছে সায়রা। ঘর ঠিক করার নির্দেশ সে দোল খেতে-খেতেই দিচ্ছে। সায়রার সামনে মিসির আলি বসে আছেন। তিনি বেশ আগ্রহের সঙ্গেই তার ঘরের সংস্কার দেখছেন।

রান্নাঘরের মধ্যবয়স্ক লোকটি ছাড়াও বারো-তেরো বছরের একটি কাজের মেয়েও সায়রা নিয়ে এসেছে। মেয়েটি অতি কর্মঠ। তার নাম নাসরিন। সে মনে হয় কথা বলে। না। মিসির আলি এখন পর্যন্ত তার মুখ থেকে একটি শব্দও শোনেন নি।

সায়রা বলল, আপনি কি একদিনের জন্য বাসাটা ছাড়তে পারবেন?

মিসির আলি বললেন, কোন ছাড়তে হবে?

সায়রা বলল, আমি আপনার বাসা ডিসটেম্পার করবে। দরজা-জানালায় নতুন পরদা লাগানো হবে। তার জন্য কিছু কাঠের কাজ করতে হবে।

মিসির আলি বললেন, ও আচ্ছা।

সায়রা বলল, আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম। আপনাকে যদি গিফট হিসেবে কোনো অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়াও হয় আপনি সেখানে যাবেন না। আপনি থাকবেন আপনার একরুমের ঘরে। কাজেই যেখানে আছেন সেটা ঠিক করে দেওয়া ভালো না?

মিসির আলি বলল, হঁ ভালো।

আমি নাসরিনকে রেখে যাচ্ছি। সে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে রাখবে। আপনার জন্য রান্না করবে। নাসরিন মেয়েটি কথা বলে না। তবে খুব কাজের। তার রান্নাও ভালো। সপ্তাহে আপনি একদিন বাজার করবেন। সেই বাজারও নাসরিন করবে। আপনাকে বাজারে যেতে হবে না। আপনার জন্য বারো সিএফটির একটা ফ্রিজ কোনা হয়েছে। একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন কেনা হয়েছে। ইলেকট্রিশিয়ান এসে কানেকশন ঠিক করে দেবে।

মিসির আলি ই বলে মাথা ঝাঁকালেন। এই মাথা ঝাঁকানোর অর্থ সম্ভবত–আচ্ছা। ঠিক আছে।

সায়রা বলল, আপনার বাসায় ইলেকট্রিক লাইন এইসব গ্যাজেটসের উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। ইলেকট্রশিয়ান মূল লাইনটাও বদলাবে। কারণ আপনার বাসায় দুই টনের একটা

এসি বসবে। এসি আপনার জন্য না। আমার জন্য। এসি ছাড়া ঘরে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। আমি যেহেতু মাঝে মধ্যে আপনার কাছে আসব, আপনার সঙ্গে কিছু সময় কাটাব–আমাকে শান্তিমতো বসতে হবে, তাই না?

মিসির আলি বললেন, সারাক্ষণ এসিতে থাকার এই অভ্যাস তোমার নিশ্চয়ই বিয়ের পর হয়েছে?

সায়রা বলল, হ্যাঁ বিয়ের পর হয়েছে। আমার স্বামী এদেশের অতি ধনবান মানুষদের একজন। তাঁর কী পরিমাণ টাকা আছে তা মনে হয় তিনি নিজেও জানেন না।

তিনি কি বর্তমানে অসুস্থ?

সায়রা একটু চমকাল। চমক সামলে নিয়ে সহজভাবে বলল, তিনি অসুস্থ আপনার এমন ধারণা কেন হল?

এমনি বললাম।

না। আপনি এমনি বলেন নি। চিন্তাভাবনা ছাড়া আপনি কথা বলেন না।

তোমার কাজের মেয়েটিকে দেখে আমার ধারণা হয়েছে। এই মেয়ে ঘর বঁটি দেবার সময় এমনভাবে বঁট দিচ্ছিল যেন কোনো শব্দ না হয়। পা ফেলছিল অতি সাবধানে। তার চিন্তা-চেতনায় এটা পরিষ্কার যে কোনোরকম শব্দ করা যাবে না। তার মানে হল এই মেয়েটি যেখানে কাজ করে সেখানে একজন অসুস্থ মানুষ আছে যে শব্দ সহ্য করতে পারে না।

সেই অসুস্থ মানুষ আমার স্বামী না হয়ে শাশুড়িও হতে পারতেন।

তা পারতেন।

তা হলে কেন বললেন, তোমার স্বামী কি অসুস্থ? কেন বললেন না, তোমার শাশুড়ি কি অসুস্থ?

মিসির আলি হেসে ফেললেন। সায়রা বলল, না, আপনি হাসবেন না। আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আমি আপনার কাছ থেকে জবাবটা চাচ্ছি।

কেন চাচ্ছ?

আপনি যে-পদ্ধতিতে রহস্যের সমাধান করেন। সেই পদ্ধতিটা জানতে চাই। শিখতে চাই।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, সায়রা শোন, আমি যা করি তা হল লজিকে ত্রুটি আছে কি না সেটা প্রথমে দেখি। যখন ত্রুটি ধরা পড়ে তখন ত্রুটিটা কেন হল সেটা নিয়ে ভাবি। তারপর লক্ষ করি আচরণগত ত্রুটি।

সেটা কী?

যেমন ধর কোনো একজন মানুষ খুব হাসিখুশি। হঠাৎ-হঠাৎ তার সেই হাসিখুশি

ভাবটা নষ্ট হয়। এটাই তার আচরণগত ত্রুটি।

আপনি আর কী দেখেন?

আর দেখি যে কথা বলে সে কতটা সত্য কথা বলে। মানুষ আল আমিন না। একমাত্র আমাদের প্রফেট আল আমিন হতে পেরেছেন, আমরা বাকি সবাই মিথ্যা বলি। এই মিথ্যাও আবার দু রকম।

দুই রকম মিথ্যা মানে?

একটা মিথ্যা হল সরাসরি মিথ্যা। আরেক ধরনের মিথ্যা আছে যে-মিথ্যাকে মিথ্যা। দলোঁ ২২ মাঁ!

মানে কী?

মানে হচ্ছে, মনে কর তুমি একটা মিথ্যা কথা বলছি, তুমি ভেবে নিচ্ছ এটা সত্যি। এই ধরনের মিথ্যা মানুষ বলে কম, লেখে বেশি।

আপনি আমার লেখা কতটুকু পড়েছেন?

এক চ্যাপ্টার।

পড়তে কেমন লাগছে?

ভালো।

বেশ ভালো না মোটামুটি ভালো?

বেশ ভালো।

বেশ ভালো যদি হয় তা হলে এক চ্যাপ্টার পড়েই পড়া থামিয়ে দিয়েছেন কেন?

আমার কিছু খটকা আছে। খটকা দূর হবার পর দ্বিতীয় চ্যাপ্টার পড়ব বলে ঠিক করেছি।

বলুন কী খটকা?

তুমি লিখেছ HBo-তে সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্বস দেখেছি। যখনকার কথা বলছি তখন এই ছবি তৈরি হয় নি। তুমি তোমার লেখায় মিথ্যা ঢুকিয়েছ। একটা মিথ্যা যখন ঢুকিয়েছ তখন ধরে নিতে হবে আরো মিথ্যা ঢুকিয়েছ। আমার কাছে এই লেখা উপন্যাস হিসেবে ঠিক আছে। কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত লেখা যা পড়ে আমি তোমার সমস্যা ধরতে পারব এবং সমস্যার সমাধান করব সেই লেখা এটা না।

আপনি ভুল ধরলে আমি ঠিক করে দেব।

সব ভুল তো ধরতে পারব না।

ভুল কিন্তু নেই। সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্বস-এর ব্যাপারটা বলি-সেই রাতে আমরা একটা ভূতের ছবি দেখি। ছবিটা যথেষ্ট ভয়ের ছিল, আমরা দুই বোনই খুব ভয় পেয়েছিলাম। আমি যখন লেখা শুরু করি তখন আর ভূতের ছবির নাম মনে করতে পারছিলাম না।

সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্বস ছবিটা তার কয়েকদিন আগেই দেখেছি সেই নামটা দিয়ে দিয়েছি। এতে কি বড় কোনো সমস্যা হয়েছে?

আমার জন্য সমস্যা। ছোটখাটো বিষয়গুলো আমার জন্য খুব জরুরি। ভালো কথা, তুমি কি প্রায়ই ভূতের ছবি দেখ?

হ্যাঁ।

দুই বোনই ভূতের ছবি দেখতে পছন্দ কর?

হ্যাঁ!

তোমার বাবা যখন বললেন ইবলিশ শয়তান তার সঙ্গে কথা বলেছে সেটা বিশ্বাস করেছ?

হ্যাঁ, কারণ বাবা কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। আর কিছু জানতে চান?

তোমার বাবা কি বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ বেঁচে আছেন।

আগের মতোই ধর্মকর্ম নিয়ে আছেন?

হ্যাঁ।

উনি তোমার সঙ্গে থাকেন, তাই না?

হ্যাঁ, উনি আমার সঙ্গে থাকেন। এই বয়সে বাবা নিশ্চয়ই একা একা থাকবেন না। আপনার কী করে ধারণা হল উনি আমার সঙ্গে থাকেন?

আন্দাজে বলছি। তাঁর দুই মেয়ে। একজন মারা গেছে আরেকজন বেঁচে আছে। তিনি জীবিত মেয়ের সঙ্গে বাস করবেন। এটাই তো স্বাভাবিক।

আপনি একটু আগে বলেছেন। আপনি শুধু প্রথম চ্যাপ্টার পড়েছেন। ইথেন যে মারা গেছে এটা আমি শেষের দিকে লিখেছি। তার মানে কিন্তু এই দাঁড়ায় যে আপনি পুরো লেখা পড়েছেন। কিন্তু বলছেন প্রথম চ্যাপ্টার পড়েছেন।

মিসির আলি শান্তগলায় বললেন, আমি প্রথম চ্যাপ্টারই শুধু পড়েছি। প্রথম চ্যান্টার পড়লেই কিন্তু বোঝা যায় যে-বোন সম্পর্কে তুমি লিখছ সেই বোন বেঁচে নেই।

আপনার কথা স্বীকার করে নিলাম। আপনি আর কী জানতে চান?

এই মুহূর্তে আমি আর কিছু জানতে চাচ্ছি না। তবে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বাবার সঙ্গে আমি আপনাকে দেখা করতে দেব না। কেন দেব না। তাও আপনি জানতে চাইবেন না।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন–ঠিক আছে।

রাত এগারোটা। মিসির আলির সারা শরীরে আরামদায়ক আলস্য। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে। মিসির আলির গায়ের উপর চাদর। চাদর গলা পর্যন্ত টেনে দিলে আরাম হত, তাতে বই পড়ার অসুবিধা। হাত চলে যাবে চাদরের ভেতর। আজ অবিশ্যি তিনি বই পড়বেন না। সায়রা বানুর লেখা আত্মজীবনীর ২য় অধ্যায় পড়বেন। চোখ ফেভাবে ভারী হয়ে এসেছে বেশি দূর পড়তে পারবেন বলেও মনে হচ্ছে না।

দরজা ধরে নাসরিন মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেই তাকে বলেছেন, মাগো, তুমি শুয়ে পড়। বেশিরভাগ সময়ই নাসরিন নামটা তাঁর মনে আসে না। তখন বলেন মাগো। কাজের মেয়েকে মাগো বলা সম্ভবত উচিত না। তিনি কিন্তু আন্তরিকভাবেই বলেন। মিসির আলির ধারণা তার নিজের কোনো মেয়ে থাকলে সে তাকে যতটা যত্ন করুত এই মেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি যত্ন করে। আজ রাতের খাবারের কথাই ধরা যাক। রাতে রান্না হয়েছে। গরুর মাংস এবং চালের আটার রুটি।

হয়েছে। নাসরিন একটা–একটা করে রুটি সেকে তাঁর পাতে দিয়েছে। এ ধরনের আদরযত্নের কোনো মানে হয় না!

মিসির আলি খাতা খুললেন। আর তখনই নাসরিন বলল, খালুজান আর কিছু লাগব?

মিসির আলি বললেন, মাগো আর কিছু লাগবে না। তুমি শুয়ে পড়।

নাসরিন সঙ্গে সঙ্গে দরজার আড়ালে সরে গেল। এই বুড়ো মানুষটা যতবার তাকে মাগো ডাকে ততবারই নাসরিনের চোখে পানি এসে যায়। সে তার চোখের পানি কাউকে দেখাতে চায় না।

নাসরিন দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে এসে বলল, খালুজান সুপারি। খাইবেন? সুপারি দেই? পান-সুপারি। আইন্যা রাখছি।

মিসির আলি বললেন, পান-সুপারি তো আমি খাই না মা। আচ্ছা ঠিক আছে এনেছ যখন দাও।

নাসরিন পান-সুপারি এনে দিল। মিসির আলি বললেন, আমাকে খালুজান ডাকা তোমার ঠিক না। খালার স্বামী হল খালু। আমি বিয়ে করি নি।

নাসরিন বলল, আমি আপনেরে খালুজানই ডাকব।

মিসির আলি বললেন, ঠিক আছে। ডেকো। তুমি কি লিখতে-পড়তে জান?

নাসরিন না-সূচক মাথা নাড়ুল।

মিসির আলি বললেন, আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাব! তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি অতি দ্রুত লেখাপড়া শিখতে পারবে। এখন যাও গো মা শুয়ে পড়। কেউ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমি পড়তে পারি না।

নাসরিন সরে গেল। কিন্তু ঘুমাতে গেল না। সাবধানে মোড়া টেনে দরজার পাশে বসল। এখান থেকে বুড়ো মানুষটাকে দেখা যায়। এই তো উনি পড়া শুরু করেছেন–

মিসির আলি খাতার পাতা উল্টালেন। শুরুতেই লেখা–

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

দ্বিতীয় অধ্যায় বাক্যটা শুধু বাংলায়। বাকিটা আগের মতোই ইংরেজিতে।

যে, ইবলিশ শয়তান নিয়ে বাবার এত সাবধানত সেই ইবলিশ শয়তানকে আমি একদিন দেখলাম। লম্বা কালো ভয়ংকর রোগ। তার গায়ে নীল রঙের শার্ট। দীর্ঘদিন জ্বরে ভুগলে যেমন হয় তেমন চেহারা। চোখ পশুদের চোখের মতো জ্বলজ্বলে।

ঘটনাটা বলি।

বাড়িতে শুধু আমরা দুই বোন। বাবা বাড়িতে নেই। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি বাড়িতে থাকেন না। তিনি তাঁর পীর সাহেবের কাছে যান। পীর সাহেব তাকে নিয়ে সারা রাত জিগির করেন।

আমরা খালি বাড়িতে যেন ভয় না পাই সেজন্য বাবার কলেজের একজন পিয়ন আমাদের সঙ্গে থাকে। পিয়নের নাম ইসমাইল। ইসমাইলের রাতকানা রোগ আছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে সে বাড়িতে আসে। এসেই বসার ঘরের সোফায় চাদর গায়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তার ঘুম ভাঙে। পরদিন সকালে। রাতের খাবারের জন্য একবার তার ঘুম ভাঙানো হয়।

আমার লেখা খানিকটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আগেরটা পরে পরেরটা আগে লিখে ফেলছি। ইবলিশ শয়তানকে আমার আগে দেখেছে ইথেন। তার গল্পটা আপে বলা উচিত। আমার অভিজ্ঞতা পরে বলছি। এক বৃহস্পতিবার রাতে ইথেন চিরুনি হাতে আমার সামনে বসতে-বসতে বলল, আপা তোর সাহস কেমন?

আমি বললাম, সাহস ভালো।

ইথেন বলল, তোর ভালো সাহসী হওয়া দরকার। সাহস কম হলে তুই বিপদে পড়বি। প্রতি বৃহস্পতিবার বাবা চলে যাবে জিগির করতে। তুই থাকবি একা।

আমি বললাম, একা থাকব। কেন? তুই তো আছিস।

ইথেন বলল, আমি তো থাকব না। আমি মারা যাব। পেটের বাচ্চা খালাস করতে গিয়ে মারা যাব। কিংবা তারও আগে ইবলিশ শয়তান আমাকে মেরে ফেলবে।

আমি বললাম, উদ্ভট কথা আমাকে বলবি না।

ইথেন বলল, আমি কোনো উদ্ভট কথা বলছি না। ইবলিশ শয়তান যে এ বাড়িতে বাস করে এটা আমি জানি। আমি দেখেছি।

কোথায় দেখেছিস?

একবার দেখেছি। ছাদে, আরেকবার দেখেছি রান্নাঘরে। সে চেহারা বদলায়। ছাদে যাকে দেখেছি আর রান্নাঘরে যাকে দেখেছি তারা দেখতে দুরকম। একজন ছিল কুচকুচে কালো আরেকজন ধবল। কুষ্ঠ রোগীর মতো সাদা।

আমি বললাম, ইথেন তুই আমাকে ভয় দেখাবি না। ইথেন বলল, ভয় দেখাচ্ছি না। যেটা ঘটেছে সেটা বলছি। পুরোপুরি বলছি। দাঁড়ি-সেমিকোলনসহ।

দরকার নেই।

দরকার আছে। আগে থেকে জানলে সাবধান থাকতে পারবি। নয়তো হঠাৎ দেখে ভয়ে ভবদা মেরে যাবি। আগে ছাদে কী দেখেছি বলি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলার কথা। সালোয়ার-কামিজ পরেছি। ওড়না খুঁজে পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হল আমি ওড়না ছাদে শুকাতে দিয়েছি। শুধু ওড়না না তার সঙ্গে দুটা ব্লাউজ ছিল। পেটিকেট ছিল। আমি ছাদে গেলাম। ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি ঘরের দরজা সব সময় খোলা থাকে সেদিন দেখলাম বন্ধ। দরজায় কোনো তালা নেই। ধাক্কা দিলে খোলার কথা। ধাক্কা দিয়েও খুলতে পারছি না!

আমি ইথেনকে বললাম, সেদিন আমি কোথায় ছিলাম?

ইথেন বলল, তুই তোর ঘরে। তোর জ্বর এসেছিল। তুই চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলি। মনে পড়েছে?

না মনে পড়ছে না।

ইথেন বলল, দাঁড়া মনে করিয়ে দিচ্ছি। তোর গায়ে অনেক জ্বর তারপরেও বাবা তোকে ফেলে রেখে জিগির করতে চলে গেল। তুই মন খারাপ করলি, এখন মনে পড়ছে?

হুঁ, মনে পড়েছে।

ইথেন বলল, গল্পের মাঝখানে কথা বলবি না। ফ্লো নষ্ট হয়ে যায়। পুরো গল্পটা একবার বলে নেই তারপর যা প্রশ্ন করার করবি। নো ইন্টারাপশান। আমি যেন কোথায় ছিলাম?

সিঁড়ি ঘরের দরজা খুলতে পারছিলি না।

হ্যাঁ সিঁড়ি ঘরের দরজা খুলতে পারছি না। ধাক্কাধাক্কি করছি। একসময় মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ফিরে আসার জন্য রওনা হয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে দু স্ট্রেপ নেমেছি তখন আপনাআপনি দরজা খুলে গেল। ঘটনাটা যে অস্বাভাবিক এটা আমার মনে হল না। আমি খুশি মনে ছাদে গেলাম। ছাদের মাঝামাঝি জায়গায় ইবলিশ শয়তানটা দাঁড়িয়ে ছিল। মিশমিশে কালো। দেখতে মোটামুটি মানুষের মতো। শুধু তার গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা। তবে শুরুতেই তার গলার দিকে চোখ গেল না। শুরুতেই যা দেখে কলিজা নড়ে গেল তা হচ্ছে জিনিসটা নগ্ন। তারপর চোখ পড়ল তার গলার দিকে। লম্বা গলার কারণে মাথাটা শরীর থেকে অনেকখানি ঝুঁকে আছে।

নগ্ন মানুষের মতো দেখতে জন্তুটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। আমি আতঙ্কে জমে গেলাম। আমার চিৎকার দেওয়া উচিত। ছাদ থেকে ছুটে নেমে যাওয়া উচিত এইসব কিছুই মনে এল না। আমি তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি।

ভূতপ্রেতের ছবিতে দেখা যায় এরা যখন হাঁটে দ্রুত হাঁটে। বাতাসের উপর দিয়ে ছুটে যায়। কিন্তু এই নগ্ন জিনিসটা পা টিপৌটিপে হাঁটছে। ছোট বাচ্চারা হাঁটা শিখলে যেভাবে হাটে তার হাঁটার ভঙ্গি সেরকম। টলমল করে হাঁটা! যেন তাকে না ধরলে সে এক্ষুনি ধপাস করে পড়ে যাবে। সে যখন আমার কাছাকাছি চলে এল তখন আমার মনে হল আমি করছি কী? আমি কেন দাঁড়িয়ে আছি? তখনই দৌড় দিলাম। পাগলের মতো সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম।

ইথেন বড় নিঃশ্বাস ফেলে থামল। আমি বললাম, ঐ নগ্ন জিনিসটা তোর পিছনে-পিছনে আসে নি?

ইথেন বলল, না।

আমি বললাম, তুই বাবাকে এই বিষয়ে কিছু বলেছিলি?

না।

বলিস নি কেন?

আমার ইচ্ছা হয় নি। দ্বিতীয়বার কী দেখলাম বলি?

আজ থাকি আরেকদিন শুনব।

ইথেন বলল, বলতে যখন শুরু করেছি আজই বলব। অন্য আরেকদিন হয়তো আমারই বলতে ইচ্ছা করবে না। সেদিনও ছিল বৃহস্পতিবার। বাবা গেছেন জিগির করতে। ঘরে

আমরা দুইজন আর বাবার কলেজের পিয়ানটা। আমার পেট ব্যথা করছিল। বলে রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়েছি! অনেক রাতে খিদের জন্য ঘুম ভেঙে গেছে। ফ্রিজে খাবার আছে একটা কিছু খেয়ে নিলেই হয়। আবার মনে হচ্ছে এখন যদি খেতে যাই ঘুম পুরোপুরি ভেঙে যাবে। এপাশি-ওপাশ করে রাত কাটবে। তারচেয়ে চোখ বন্ধ করে। ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি। ঘুমিয়ে পড়লে ক্ষুধা টের পাব না। তখন শুনলাম ডাইনিং হলে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। কে যেন চেয়ার নাড়াচ্ছে। বেসিনে পানি ঢালার শব্দও হল। আমি উঠে বসলাম। বাতি জ্বালালাম। ঘর থেকে বের হলাম। ডাইনিং হল অন্ধকার। তবে সেখানে যে কেউ আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। আবার চেয়ার টানার শব্দ হল। আমি ডাইনিং হলের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পরদা টানলাম। স্পষ্ট দেখলাম আমার দিকে পিছন ফিরে একজন কেউ বসে আছে। তার সামনে একটা প্লেট, প্লেট থেকে খাবার নিয়ে সে খাচ্ছে। আমি বললাম, কে? সে খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে ফিরল। মানুষের মুখের মতো একটা মুখ। শুধু তার চোখ দুটা পশুদের চোখের মতো। পশুদের চোখ যেমন অন্ধকারে জ্বলে তার চোখও অন্ধকারে জ্বলছে। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার খেতে শুরু করল। যেন আমার উপস্থিতিতে তার কিছু যায় আসে না। আমি তোকে ডেকে তুললাম এবং বললাম আজ রাতে তোর সঙ্গে ঘুমাব। তোর মনে আছে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

এটা কি মনে আছে। সারা রাত তোকে ঘুমাতে দেই নি। হাসাহসি করেছি। গল্পগুজব করেছি। তারপর দিলাম টিভি ছেড়ে। কী যেন একটা হিন্দি ছবিও দেখলাম।

মনে আছে।

পরদিন ভোরে ডাইনিং হলে গিয়ে দেখেছি প্লেট পড়ে আছে। প্লেটে আধা খাওয়া খাবার।

আমি বললাম, কী খাবার?

ইথেন বলল, সাধারণ ভাত-মাছ। ভাল।

আমি বললাম, জিন-ভূত কি ভাত-মাছ খায়?

ইথেন বলল, আমি তো জানি না। জিন-ভূত কী খায়। আমি জিন-ভূত না।

আমি বললাম, এমন কি হতে পারে না যে ভাত-মাছ-ডাল তুই নিজেই খেয়েছিস। তারপর ঘুমাতে গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিস।

ইথেন আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। তার মুখ দেখে মনে হল আমার কথা সে একেবারে যে অগ্রাহ্য করছে তা না। জিনের খাদ্য কী এই নিয়ে সব সময় তার মাথাব্যথা ছিল। জিন কী খায়, ভূত কী খায় এই নিয়ে বাবাকে প্রায়ই প্রশ্ন করে। বাবা অসম্ভব বিরক্ত হতেন।

বাবা জিনের খাদ্য কী?

বাবা বললেন, জানি না মা।

তুমি এমন ধর্মকর্ম করা মানুষ। তুমি না জানলে কীভাবে হবে?

বাবা বললেন, আমি ধর্মকর্ম করলেও ধর্মের অনেক কিছু জানি না।

ইথেন বলল, যে জানে তার কাছ থেকে জেনে দাও। তোমার পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস কর।

বাবা বললেন, এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে ভালো লাগে নারে মা।

তুমি তো কারে সঙ্গে আলোচনা কর নি। তুমি বুঝবে কীভাবে আলোচনা করতে ভালো লাগে কি লাগে না?

মাগো বিরক্ত করিস না।

আমার প্রশ্নের জবাব বের না করে দিলে আমি বিরক্ত করেই যাব।

জিনের খাদ্য কী জেনে তুই কী করবি?

ওদের সব খাদ্য যোগাড় করে রাতের বেলা টেবিলে সাজিয়ে রাখব যাতে ওরা এসে খেতে পারে। জিনের খাদ্য নিয়ে আমি একটা বই লিখিব বলেও ঠিক করেছি। বইটার নাম হবে–জিনের সুষম খাদ্য। আরেকটা বই লিখব–জিনের খাদ্য ও পুষ্টি। এটা হবে রান্নার বই। সেখানে সব খাবারের রেসিপি দেওয়া থাকবে।

বাবা হতাশ গলায় বললেন, মারে তোর তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ইথেন গম্ভীর গলায় বলল, মাত্র শুরু আরো হবে।

আরো যে হবে। আমরা তার লক্ষণ দেখলাম। সে তার কোনো এক টিচারের কাছ থেকে খবর আনল জিনের পছন্দের খাবার মিষ্টি। মিষ্টির দোকানে তারা গভীর রাতে যায়। সব মিষ্টি খেয়ে দাম দিয়ে চলে যায়। যে কারণে গ্রামের অন্য সব দোকান সন্ধ্যার সময় বন্ধ হয়ে গেলেও মিষ্টির দোকানগুলো গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

ইথেন প্রতি রাতে ঘুমাতে যাবার আগে তেরোটা সন্দেশ একটা থালায় রাখে। তারের জালির ঢাকনা দিয়ে থালাটাকে ঢেকে রাখে যাতে বিড়াল এসে খেতে না পারে। সারা রাত সন্দেশের থালা থাকে। ডাইনিং টেবিলে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ইথেন সন্দেশ গোনে। তেরোটা সন্দেশই আছে না। জিন এসে খেয়ে কমিয়েছে। তেরোটা সন্দেশের রহস্য হল ইথেনের লকি নাম্বার তেরো। তার জন্ম তারিখ অক্টোবরের তেরো।

সন্দেশ রাখার চতুর্থ দিন ভোরবেলায় হইচই শুরু হল। দেখা গেল সন্দেশ আছে বারোটা। একটা কম। জিন এসে একটা সন্দেশ খেয়ে গেছে। ইথেন আনন্দ এবং উত্তেজনায় লাফাচ্ছে! আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, জিন সন্দেশ খেয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

ইথেন বলল, কেন মনে হচ্ছে না।

আমি বললাম, জিনের যেমন মিষ্টিপ্রীতির কথা শুনেছি তারা একটা সন্দেশ খাবে না। কয়েকটা খাবে। সন্দেশ খাবার পর তারা পানি খাবে না। এই জিন সন্দেশ খাবার পর পানি খেয়েছে। সন্দেশের থালার কাছে আধা খাওয়া পানির গ্লাস।

ইথেন মুখ কালো করে বাবার কাছে গেল। থমথমে গলায় বলল, বাবা রাতে তুমি সন্দেশ খেয়েছ?

বাবা বিব্রত গলায় বললেন, একটা সন্দেশ খেয়েছি মা। হঠাৎ ক্ষুধা লাগল।

ইথেন কাঁদতে শুরু করল। বাবা বললেন, কাঁদার কী হয়েছে? বারোটা সন্দেশ তো তোর জিনের জন্য রাখা ছিল।

ইথেন সারা দিন কিছু খেল না। সেই রাতে দেখা গেল-বারোটা সন্দেশের একটাও নেই। কেউ এসে খেয়ে গিয়েছে।

তার পরের সপ্তাহেই আমি জিন বা শয়তান বা ইবলিশকে দেখলাম। তার সঙ্গে কথা বললাম। এই বিষয়টি আমি বিস্তারিত বর্ণনা করব।

শ্রাবণ মাস। বৃহস্পতিবার রাত। বৃষ্টি শুরু হয়েছে সন্ধ্যা থেকে। শ্রাবণ মাসের টিপটপ বৃষ্টি না। আষাঢ় মাসের ঝমোঝমা বৃষ্টি। ঝমোঝমা বৃষ্টি হলেই ইথেনের বৃষ্টিতে ভেজার শখ হয়। তার পাল্লায় পড়ে আমিও বৃষ্টিতে গোসল করেছি। পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা। আমার ঠাণ্ডার ধাত। সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই টনসিল ফোলে। জ্বর এসে যায়। আমরা গোসল করছি। ছাদে। আমার ইচ্ছা খানিকক্ষণ ভিজেই উঠে পড়ব। ইথেন আমাকে ছাড়ল না। যতবার উঠতে যাই সে আমাকে জাপটে ধরে রাখে। প্রায় এক ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজলাম। আমার টনসিল ফুলে গেল। জ্বর এসে গেল। রাতে জ্বর বাড়ল। জ্বরের সঙ্গে তীব্র মাথাব্যথা। ইথেনের কাছে মাথাব্যথার ট্যাবলেট আছে। আমি দরজা খুললাম। ইথেনের কাছ থেকে

ট্যাবলেট নেব এবং রাতে তার সঙ্গে ঘুমোব। অসুখবিসুখ হলে আমি একা ঘুমাতে পারি না।

বারান্দায় এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। শার্ট-প্যান্ট পরা এক লোক বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে আছে। বসে আছে ঠিক না খবরের কাগজ পড়ছে। লোকটার চোখে ভারী চশমা। চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো। শান্ত ভদ্র চেহারা। চেহারা দেখে মন হল তাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি।

রাত বাজে দুটা। এত রাতে কেউ গম্ভীর ভঙ্গিতে খবরের কাগজ পড়ে না। আমি বললাম, আপনি কে?

লোকটা খবরের কাগজ ভাঁজ করে পাশের চেয়ারে রাখতে–রাখতে বলল, আপনি ভালো আছেন? লোকটার গলার স্বর মিষ্টি! কথা বলার ভঙ্গিতে কোনো আড়ষ্টতা নেই। যেন আমি তার পূর্ব-পরিচিত। তাকে দেখাচ্ছিল পূর্ব-পরিচিতের মতোই। আমি আবারো বললাম, আপনি কে?

লোকটি বলল, বসুন তারপর বলছি।

আমি বললাম, আমি কি আপনাকে চিনি? আগে কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

লোকটি বলল, অবশ্যই দেখা হয়েছে। আমি ইবলিশ শয়তান। বলেই লোকটা হাসল। তখনি বুঝলাম আমি স্বপ্ন দেখছি। ইবলিশ শয়তান সেজেগুঁজে রাত দুটোর সময় আমাদের

বাড়ির বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়বে না। শুরুতে যে ভয়টা পেয়েছিলাম সেটা কেটে গেল। আমি বললাম, ইবলিশ শয়তান আপনি ভালো আছেন?

সে বলল, মিথু দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো।

আমি আবার চমকালাম। আমার নাম মিথেন। কিন্তু একজন মানুষ আমাকে মিথু ডাকত। যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম তখন আমার একজন প্রাইভেট মাস্টার ছিলেন! আমাকে অঙ্ক করাতেন। তার নাম রকিব। আমি যাকে ইবলিশ শয়তান ভাবছি। সে আসলে রকিব স্যার।

মিথু আমাকে চিনতে পারছ? আমরা শয়তানরা নানান রূপ ধরতে পারি। আমি তোমার অতি প্রিয় একজনের রূপ ধরে এসেছি।

আমি বললাম, রকিব স্যার কখনোই আমার অতি প্রিয় একজন ছিলেন না।

অবশ্যই ছিলেন। তোমার মনে নেই একদিন পড়াতে-পড়াতে তিনি হঠাৎ টেবিলের নিচে তোমার পায়ের উপর পা তুলে দিলেন। তুমি কিন্তু আঁতকে উঠে পা সরিয়ে নাও নি। চুপ করেই সারাক্ষণ বসে ছিলে। রকিব স্যার সারাক্ষণ পা দিয়ে পা ঘষেছেন। হা হা হা।

আমি বললাম, আমি পা সরিয়ে নেই নি এটা ঠিক। সরিয়ে নেই নি কারণ আমি তাঁকে লজ্জা দিতে চাই নি। আপনি এত কিছু যখন জানেন তখন আপনার জানা থাকা উচিত যে সেই দিনই ছিল রকিব স্যারের কাছে আমার শেষ পড়া। আমি এরপর তাঁর কাছে আর পড়ি নি।

রেগে যাচ্ছ কেন মিথু?

আমাকে মিথু বলে ডাকবেন না।

আচ্ছা যাও ডাকব না। বসে গল্প করি।

আপনার সঙ্গে আমার গল্প করার কোনো ইচ্ছা নেই।

ইচ্ছা না থাকলেও তোমাকে গল্প শুনতে হবে। এখন আর তোমার আলাদা ইচ্ছা বলে কিছু নেই। আমার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছ। বসতে বলছি বস।

আমি বসলাম। লোকটা বলল, কী নিয়ে গল্প করা যায় বলো তো? আমি জবাব দিলাম না! লোকটা আমার দিকে ঝুকে এসে বলল, জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলার আগে কিছুক্ষণ সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলি যেমন জিনের খাদ্য। তোমার বোনের ধারণা জিনরা মিষ্টি খায়। ধারণা ঠিক না। তারা মানুষ যে-অর্থে খাদ্য গ্রহণ করে সেই অর্থে খাদ্য গ্রহণ করে না। তোমরা মানুষরা মাছ-মাংস, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ জাতীয় পদার্থ কত কিছু খাও। গাছ খায় শুধু পানি এবং সূর্যের আলো। কিছু কিছু ক্যাকটাস গোত্রের গাছ পানিও খায় না। সূর্যের আলোই তাদের জন্য যথেষ্ট! তোমরা মানুষরা যেমন একটা স্পেসিস, গাছও তেমন একটা স্পেসিস। একই পৃথিবীতে বাস করছ অথচ কী বিরাট পার্থক্য। জিন সম্পূর্ণ আলাদা একটা স্পেসিস। এই ব্যাপারটা তোমার বোনকে বুঝতে হবে। মানুষের মানদণ্ডে তাদের বিচার করা যাবে না।

আমি বললাম, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে নাকি আরো কিছু বলবেন?

জ্ঞান বিতরণ অনুষ্ঠান শেষ এখন সন্দেহ বিতরণ অনুষ্ঠান।

তার মানে?

ইবলিশের কাজ কী? ইবলিশের কাজ মানুষের মনে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া। মানুষের মন সন্দেহের বীজের জন্য অতি আদর্শ জমি। অতি উর্বর। কোনোরকমে একটি সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিতে পারলে আর দেখতে হবে না। কিছু দিনের মধ্যেই সেই বীজ থেকে চারা হবে। দেখতে-দেখতে সেই চারা পত্রপল্লবে শোভিত হয়ে বিরাট মহীরুহ।

আপনি সন্দেহের কোন বীজ ঢুকাতে চান?

তোমার মা বিষয়ক সন্দেহ বীজ।

মানে?

মিথু মন দিয়ে শোন–

তোমার মা কি ধর্মকর্ম করতেন? নামাজ-রোজা? বলো, না। কারণ আমি জানি এর উত্তর, না।

না।

মৃত্যুর পর তাঁর যে কবর হয়েছে তোমরা দুই বোন সেই কবর জিয়ারত করতে গিয়েছি? বিলো-না। কারণ এর উত্তর যে না সেটা আমি জানি।

কবর জিয়ারত করতে আমরা যাই নি। কারণ তাঁর কবর হয়েছে। বগুড়ার এক গ্রামে। সারিয়াকান্দি। অনেক দূরের ব্যাপার।

তার যে কবর হয়েছে এই বিষয়ে কি তোমরা নিশ্চিত? তোমরা কী তোমার মাকে কবর দিতে দেখেছ?

আমরা দেখি নি। বাবা ডেডবিড নিয়ে একা গেছেন। তখন আমরা দুই বোনই অসুস্থ ছিলাম। ইথেনের ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়েছিল।

তোমাদের মার দিকের কোনো আত্মীয়স্বজন কখনো তোমাদের বাড়িতে এসেছিলেন? বলো-না। কারণ এই প্রশ্নের উত্তরও না। আমি জানি।

না।

এখন দুইয়ে দুইয়ে চার মিলালে কেমন হয়? আমি যদি বলি তোমাদের আদর্শ পিতা একটি হিন্দু মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সেই হিন্দু মেয়ে তার ধর্ম ত্যাগ করে নি। কাজেই তাদের বিবাহ হয় নি। অর্থাৎ তোমরা দুই বোন জারজ সন্তান। হা হা হা।

হাসবেন না।

হাসব না কেন? মজার ব্যাপার না? অতি ধার্মিক বাবা দুই জারজ কন্যা নিয়ে ঘুরঘুর করছে! এর মধ্যে একজন আবার সন্তানসম্ভব। সেই সন্তানও একই জিনিস। জরিজে জারজে ধুল পরিমাণ। হা হা হা।

লোকটা হাসছে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা বদলে যাচ্ছে। গায়ের রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে। দাঁত বের হয়ে আসছে। চুল হয়ে যাচ্ছে লালচে এবং লোকটার গা থেকে অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ আসতে শুরু করেছে। গন্ধটা পরিচিত। তবে আমি ধরতে পারছি না। লোকটা বলল, তুমি কি কোনো গন্ধ পাচ্ছ? নিশ্চয়ই পাচ্ছি। তুমি ভাবছ গন্ধটা আমার শরীর থেকে আসছে। তা না, গন্ধ আসছে তুলসী গাছ থেকে। তুলসীর গন্ধ। তোমার মা। টবে তুলসী গাছ লাগিয়েছিলেন। হিন্দু মহিলার বাড়িতে তুলসী গাছ থাকবে না তা কি হয়? আচ্ছা তোমরা তুলসী গাছে ঠিকমতো জল দাও। পানি না বলে জল বলছি লক্ষ করছ? হা হা হয়। মিথু তোমার সঙ্গে কথা বলে বড়ই আরাম পাচ্ছি। বোল হরি হরি বোল। মিথু শোন আমি এখন বিদায় হচ্ছি। আবার আসব। আসতেই থাকব। তোমার তোমার শিক্ষকের মতো পা দিয়ে ঘষাঘষি করব। ঠিক আছে লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কণা।

আমি বললাম, আমি যা দেখছি সবই স্বপ্ন। আপনি দূর হন।

তুমি না বললেও দূর হয়ে যাব। দেহধারণ করে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। তবে তুমি যা দেখছি সবই স্বপ্ন এটা কিন্তু ঠিক না। স্বপ্নে মানুষ গন্ধ পায় না। তুমি গন্ধ পেয়েছ। পবিত্র তুলসীর গন্ধ। সবই যদি স্বপ্ন হয় তা হলে গন্ধটা আসে কোত্থেকে! যাবার আগে একটা প্রশ্ন তোমার বোনের পেট খালাসের কী করেছ? দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। ব্যবস্থা এখনই নেওয়া দরকার। তুমি বললে আমি নিজেও চেষ্টা নিতে পারি। ছাদ থেকে নিচে ফেলে দিতে পারি। তবে মানুষ মেরে আমি আনন্দ পাই না। মানুষ খেলিয়ে আরাম পাই। মরে যাওয়া মানে শেষ। আর তাকে দিয়ে খেলানো যাবে না। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই সে খেলবে। খেলা দেখব। আনন্দ পাব। আনন্দ পাব হাসব। হা হা হা।

হাসির শব্দে আমার ঘুম ভাঙল। আমি বুঝলাম এতক্ষণ যা দেখেছি সবই স্বপ্ন। তবে পুরোপুরি স্বপ্নও বোধ হয় না। ঘরে তুলসীর গন্ধ। আমার মা বড় দুটা টবে তুলসী গাছ লাগিয়েছিলেন। গাছ দুটা খুব ভালো হয়েছে। ঝুপড়ির মতো হয়েছে।

এই ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ পরের ঘটনা, সেদিনও বৃহস্পতিবার। বাবা যথারীতি জিগিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মাগরিবের নামাজ পড়ে চলে যাবেন ফিরবেন। পরদিন ফজরের নামাজের পর। সন্ধ্যা হয়—হয় করছে। ইথেন দুটা মগ হাতে আমার কাছে এসে বলল, আপা চল তো। আমি বললাম, কোথায়?

ইথেন বলল, ছাদে। সন্ধ্যাকেল ছাদে বসে চ খেতে আমার ভালো লাগে। একা যেতে ভয়-ভয় লাগে তুইও চল।

আমি বললাম, না।

ইথেন বলল, তোকে যেতেই হবে।

ইথেন কিছু বলবে। আর তা করবে না তা কখনো হয় না। তার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আমাকে ছাদে যেতে হল। আমাদের বাড়ির ছাদটা সুন্দর। মার বাগানের শখ ছিল। ছাদে বাগান করেছিলেন। বিশাল সাইজের টবে দেশী ফুল গাছ। কামিনী, গন্ধরাজ, বেলি। কয়েক রকমের বাগান বিলাসও আছে। এর মধ্যে একটার পাতা হালকা নীল রঙের। এই গাছটা নাকি তিনি আসামের শীলচর থেকে আনিয়েছিলেন। ছাদের বাগান খুব সুন্দর লাগছিল। বাগান বিলাসের তিন চার রকম রঙ। বেলি ফুলের সিজন না বলে

বেলি ফুল নেই। বেলি ফুল যখন ফুটত তখন মা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছাদের বাগানে বসে থাকত।

আমরা দুই বোন বসে চা খাচ্ছি। ইথেনকে হাসিখুশি লাগছে। সে অবিশ্যি এমনিতেই হাসিখুশি তবে সেদিন তাকে অস্বাভাবিক উৎফুল্ল লাগছিল। সে বলল, আপা তোকে মজার একটা খবর দিতে পারি। দেব? আমি বললাম, না। ইথেনের মজার খবর মানেই হল উদ্ভট কিছু যা শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। ইথেন বলল, তোকে আমি ছাদে নিয়ে এসেছি। মজার খবরটা দেওয়ার জন্য। খবরটা হল আমাদের মা ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। মার নাম রমা গাঙ্গোপাধ্যায়।

আমি বললাম, তোকে কে বলেছে?

ইথেন বলল, আমাকে কেউ কিছু বলে নি। আমি নিজেই মহিলা শার্লক হোমসের মতো বের করেছি। তালা ভেঙে পুরোনো ট্রাঙ্ক ঘাটাঘাঁটি করে অনেক কিছু পেয়েছি। বাবার হাতের লেখা দশটা চিঠি। সব চিঠির সম্বোধন-রমা। ইনিয়েবিনিয়ে লেখা ইষ্টিমিষ্টি চিঠি। বাবার লেখা প্রেমপত্র পড়ার মজাই অন্য রকম। আপা তুই পড়বি? আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, না।

ইথেন বলল, পড়লে তোর ভালো লাগবে। একটু কড়া মিষ্টি। তোর বানানো চায়ের মতো বেশি মিষ্টি।

আমি বললাম, ট্রাঙ্ক ঘেঁটে এইসব গোপন চিঠিপত্র বের করা কি ঠিক?

ইথেন বলল, ঠিক না। কিন্তু আমরা তো সব সময় ঠিক কাজটা করি না। মাঝে মধ্যে বেঠিক কাজ করি। তবে আপা তুই আমার দিকে এত কঠিন চোখে তাকাস না। এতক্ষণ তোর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে কোনো তথ্য বের করি নি। আমাকে যা বলার বলেছে। ইবলিশা শয়তান এবং আমার ধারণা ইবলিশের কথা ঠিক। আমরা এই বাড়িতে মোটামুটি সত্যবাদী একজন ইবলিশ পেয়েছি।

ইবলিশ যে সত্যি কথা বলেছে তার প্রমাণ কী?

প্রমাণ বাবা স্বয়ং। আমি তাকে শক্ত করে ধরেছিলাম। তিনি খকখক করে কাশতে-কাশতে সব বলে দিয়েছেন। বাবা আসলে আমাকে ভয় পায়।

তুই ভয় পাওয়ার মতোই মেয়ে।

অবশ্যই। ইবলিশ নিজেও আমাকে ভয় পায়। আমাকে ডাকে ছোট আপা। হিহিহি।

তোকে ছোট আপা ডাকে?

হুঁ। আমিও তাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখি। গল্পগুজব করি। একটা মজার ব্যাপার জান আপঃ শয়তানের সব গল্প কিন্তু শিক্ষামূলক। ঈশপের গল্পের মতো। গল্পের শেষে মোরাল থাকে। শয়তানের একটা গল্প তোমাকে বলব স্বাপা? যদি মজা না পাও তা হলে আমি আমার নিজের নাম বদলে ফরমালডিহাইড রাখব। আপা ফরমালডিহাইডের ফর্মুলা HCHO না?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ইথেন বলল, আপা চলে যাচ্ছিস? সন্ধ্যাটা মিলাক। সন্ধ্যা মিলাবার সময় একটা মজা হবে। মজাটা দেখে যা।

কী মজা হবে?

মা ছাদের যে জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে নিচে লাফ দিয়ে পড়েছিল। আমি ঠিক সেই জায়গা থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ব। তোদের সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাব। আমার পেটের বাচ্চা নিয়ে তোদের চিন্তায় অস্থির হতে হবে না। আমি ইবলিশ ভাইজানের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছি। ভাইজান বলেছেন-ছোট আপা একটা ভালো বুদ্ধি। হি হি হি।

ইথেনের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কথা বলার অর্থ হয় না। আজান পড়ে গেছে। আমি মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য নিচে নোমলাম। সবেমাত্র জায়নামাজে দাঁড়িয়েছি-ধূপ করে শব্দ হল। ইথেন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

যেহেতু অস্বাভাবিক মৃত্যু ইথেনের সুরতহাল হয়েছিল। তার পেটে কোনো সন্তান ছিল না। পেটে সন্তানের পুরো বিষয়টাই ছিল তার বানানো।

৫. আত্মজীবনীর তৃতীয় অধ্যায়

আত্মজীবনীর তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্যু ভয়াবহ একটি ব্যাপার। মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার কি আছে? অবশ্যই আছে। মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার আমি ঘটতে দেখলাম। ইথেন মারা গেল সন্ধ্যাবেলায়। রাত দশটায় পুলিশ এসে বাবাকে অ্যারেক্ট করে নিয়ে গেল। রমনা থানার ওসি জানালেন, থানায় এক মহিলা টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে তিনি স্পষ্ট দেখেছেন ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি পরা দাড়িওয়ালা এক লোক ইথেনকে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলেছে। আমাদের বাড়ির পাশের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে তিনি থাকেন। তিনি তার পরিচয় জানাতে চান না। এবং এই বিষয়ে আর কিছু বলতেও চান না। তিনি চান পুলিশ তদন্ত করে বিষয়টা বের করুক। মহিলার টেলিফোন কলের পরপরই পুলিশ একজন পুরুষ মানুষের কল পায়। তিনিও একই কথা বলেছেন।

আমি ওসি সাহেবকে বললাম, ঘটনাটা যখন ঘটে তখন বাবা নামাজ পড়ছিলেন। আমিও একই ঘরে নামাজ পড়েছি। শব্দ শোনার পর দুজন একসঙ্গে ছুটে গেছি।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি কিন্তু আমাদের তদন্ত করতেই হবে।

আমি বললাম, যে-মানুষটার মেয়ে মারা গেছে তাকে আপনি ধরে নিয়ে যাবেন। আজই নিতে হবে? দুই-একদিন পরে নিয়ে যান।

আজই নিতে হবে। তদন্ত দ্রুত হতে হয়।

ওসি সাহেবকে কিছু টাকা পয়সা দিলে কাজ হত। আমার মাথায় আসে নি। তারা বাবাকে নিয়ে গেল। শুধু যে বাবাকে নিয়ে গেল তা-না, ইথেনকে নিয়ে গেল। তার মৃত্যু অস্বাভাবিক। কাজেই পোষ্টমর্টেম করা হবে।

আমি এক বাসায় রইলাম। দুনিয়ার লোকজন ঘরে ঢুকছে। ঘর থেকে বের হচ্ছে। সবাই অপরিচিত। এর মধ্যে ক্যামের গলায় সাংবাদিকও আছে। সাংবাদিক ফ্ল্যাশ দিয়ে আমার একটা ছবি তুলল। তখন আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। আমি চিৎকার করে বললাম, কেন আপনি আমার ছবি তুললেন? কোন সাহসে আপনি আমার ছবি তুললেন? কেউ আমার বাড়িতে থাকতে পারবেন না। কেউ না। যে বাড়িতে ঢুকবে তাকেই আমি খুন করে ফেলব।

সত্যি-সত্যি আমি রান্নাঘর থেকে বঁটি নিয়ে এলাম। আমার উন্মাদ চেহারা দেখে ভয়েই লোকজন বের হয়ে গেল। তবে পুরোপুরি গেল না। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা পাকাতে লাগল। কিছু রিকশা দাঁড়িয়ে গেল। রিকশার যাত্রীরা সিটের উপর দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে। দর্শকদের কেউ কেউ আবার ঢ়িল ছুড়ছে। বাবাকে নিয়ে যাবার সময় ওসি সাহেব একটা ভদ্রতা করলেন। বাড়ির সামনে দুজন পুলিশ রেখে গেলেন। তাদের দায়িত্ব কাউকে ঘিরে ঢুকতে না দেওয়া।

ওসি সাহেব যখন বাবাকে নিয়ে যাচ্ছেন তখনো আমি বাবার মধ্যে তেমন কোনো অস্থিরতা দেখলাম না। তিনি সারাক্ষণই মাথা নিচু করে রাখলেন। আমাকে একসময় চাপা গলায় বললেন, ইবলিশের কাজ কেমন পরিষ্কার দেখলি? সে আরো অনেক কিছু করবে। সাবধান থাকবি।

আমি বললাম, কীভাবে সাবধান থাকব?

বাবা বললেন, দমে-দমে আল্লাহ্‌র নাম নিবি। কিছুক্ষণ পরে-পরে আয়তুল কুরাসি পড়ে হাততালি দিবি। হাততালির শব্দ যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত ইবলিশ আসবে না। ঘরে সব বাতি জ্বালিয়ে রাখবি। ঘর যেন অন্ধকার না থাকে। ইলেকট্রিক বালু। জুলছে। জুলুক। হারিকোনও জ্বালিয়ে রাখ।

আমি চাচ্ছিলাম ইবলিশ শয়তান আসুক। তার সঙ্গে কথা বলি। দেখি সে আসলে কী চায়। আজ তার আসতে সমস্যা নেই। বাড়ি খালি। খালি বাড়িতে আমি একা হাঁটছি।

ইবলিশ শয়তান এল না। রাত বারোটার দিকে বাবা ফিরলেন। পুলিশের জিপ এসে বাবাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। রমনা থানার সেকেণ্ড অফিসার ছিল বাবার ছাত্র। তার কারণেই বাবা বিনা ঝামেলায় ছাড়া পেয়ে গেলেন। ইথেনের ডেডবডি পাওয়া গেল না। তাকে রাখা হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। তার পোষ্টমর্টেম হবে। পরদিন সকাল দশটায়। পোষ্টমর্টেম হবার আগে আমাদের কিছু করার নেই।

বাবা প্রতি বৃহস্পতিবার যে পীর সাহেবের কাছে যেতেন। ওনার কাছে খবর পৌছেছিল। উনি রাত একটার দিকে চলে এলেন। দোয়া-দরুদ পড়ে বাড়ি বন্ধন করলেন। বসার ঘরের মেঝেতে বিছানা করা হল। বিছানায় জয়নামাজ বিছানো হল। আগরবাতি জ্বালানো হল। বাবা তাঁর পীর সাহেবকে নিয়ে কোরান শরিফ পাঠ করা শুরু করলেন। বাবার এই পীর সাহেবকে আমার পছন্দ হল। তিনি সত্ত্বনাসূচক কোনো কথাবার্তায় গেলেন না। তাকে

দেখে মনে হচ্ছিল তিনি একটা কাজ হাতে নিয়ে এসেছেন। কাজটা সুন্দর মতো করবেন। এর বেশি কিছু না। আমাকে তিনি শুধু একটি কথাই বললেন, মাগো! সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

রাত কত হয়েছে আমি জানি না। আমি বসে আছি ইথেনের ঘরে। টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। টেবিলল্যাম্পের আলো ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই। ইথেনের বিছানা এলোমেলে। দুটা বালিশের একটা মেঝেতে। খাটের নিচে গাদা করে রাখা কাপড়। ধোপার বাড়িতে যাবার জন্য আলাদা করে রাখা। দেওয়ালে ইথেনের ছোটবেলার আঁকা ছবি। চারটা ছবি। ফ্রেম করে বাঁধানো। গ্রাম ঘর বাড়ি। নদীতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রাখাল বালক বাঁশি বাজাচ্ছে। আমাদের দু বোনের একটা ফটোগ্রাফও আছে। কক্সবাজারে সমুদ্রে নেমেছি। তার ছবি। ইথেন সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শাড়ি সামান্য উঁচু করছে। তার সুন্দর ফরসা পা দেখা যাচ্ছিল। এখন অবিশ্যি দেখা যাচ্ছে না। বাবা কালো স্কচ টেপ দিয়ে পায়ের এই অংশ ঢেকে দিয়েছেন।

আমার অদ্ভুত লাগছে। আমি একজন মৃত মানুষের ঘরে বসে আছি। এখনো তার শরীরের গন্ধ ঘরে ভাসছে অথচ সে নেই। পাশের ঘর থেকে কোরান পাঠের আওয়াজ আসছে। মাঝে-মাঝে আসছে আগেরবাতির গন্ধ। এই গন্ধটা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই বাড়িতে মৃত্যু এসেছে।

কোথায় রেখেছে ইথেনকে? এই চিন্তাটা অস্পষ্টভাবে আমার মাথায় আসছে! চিন্তাটা দূর করতে চাচ্ছি কিন্তু পারছি না। ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ কেমন আমি জানি না। আরো অনেক বেওয়ারিশ লাশের সঙ্গে সে শুয়ে আছে? নাকি তাকে আলাদা রাখা হয়েছে?

সে কি শুয়ে আছে ঠাণ্ডা মেঝেতে? নাকি টেবিলে রাখা হয়েছে? সকালবেলা ডাক্তাররা আসবেন। কাটাকুটি করবেন।

দরজায় টোকা পড়ছে। কেউ যেন খুব সাবধানে দরজা টানছে। আমি বললাম, কে?

দরজার ওপাশ থেকে চাপা গলায় কেউ একজন বলল, আপা আসব?

আমি এই গল চিনি। ইথেনের গলা। সামান্য ভাঙা ভাঙা। ঠাণ্ডা লাগলে ইথেনের গলা সামান্য ভেঙে যায়। আমি আবারো বললাম, কে?

দরজার ওপাশ থেকে ইথেন বলল, আপা তুমি যদি ভয় না পাও তা হলে আমি ঘরে আসব। আসি?

আমি জবাব দিলাম না। আমার মাথা কাজ করছে না। ইথেনের ঘরে বসে তার কথা ভাবছিলাম বলেই কি আমি প্রবল ঘোরের জগতে চলে গেছি? হেলুসিনেশন হতে শুরু করেছে? আমার এখন কী করা উচিত? বাবাকে ডাকা উচিত। নাকি আমি ইথেনকে ঘরে ঢুকতে বলব?

দরজায় ইথেনের হাত দেখা যাচ্ছে। চুড়ি পরা ফরসা হত। সবুজ কাচের চুড়ি। কত উঁচু থেকে সে পড়েছে। হাতের সব চুড়ি ভেঙে যাওয়ার কথা! অথচ এখনো হাত ভর্তি চুড়ি। সে দরজা আস্তে করে ভেতরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই তো ইথেনকে দেখা যাচ্ছে। তার বড় বড় চোখ ফরসা শান্ত চেহারা।

আপা তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

না।

ওরা আমাকে ঠাণ্ডা একটা বাক্সে ভরে রেখেছে। ভয় লাগছিল বলে চলে এসেছি। বেশিক্ষণ থাকব না। আপা বসব?

বোস।

বাতিটা নিভিয়ে দেবে? বাতির জন্য তাকাতে পারছি না। আলো চোখে লাগছে। আমি যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে বাতি নিবালাম। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হল না। বারান্দার বাতি জ্বলছে। তার আলো খোলা দরজা দিয়ে আসছে। সেই আলোয় ইথেনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমার ক্ষীণ সন্দেহ হল সে কি আসলেই ইথেন? নাকি ইবলিশ শয়তান ইথেনের রূপ ধরে এসেছে? নাকি পুরো ব্যাপারটাই একটা প্রবল ঘোর।

আপা বাবার সঙ্গে ঐ লোকটা কে?

ওনার পীর সাহেব।

তোকে একটা কথা বলতে এসেছি আপা! কথাটা বলে চলে যাব।

বল কী কথা?

তুই সাবধানে থাকিস। ইবলিশ শয়তান তোকে মারবে। সামান্য অসাবধান হলেই মারবে।

কীভাবে সাবধানে থাকব?

তাকে তুই ধাঁধার মধ্যে রাখবি। সে যেন তোকে পরিষ্কার কখনো বুঝতে না পারে।

কী রকম ধাঁধা?

তুই যে তার মতলব জানিস এটা তাকে বুঝতে দিবি না। আমার বুদ্ধি কম আমি তার কাছে ধরা খেয়ে গেছি। তোর বুদ্ধি বেশি তুই পারবি।

ইথেন আমার বুদ্ধি কিন্তু বেশি না।

তা হলে এক কাজ কর। খুব বুদ্ধি আছে এমন কারোর কাছে যা।

খুব বুদ্ধি আছে এমন কাউকে আমি চিনি না।

এখন চিনিস না পরে চিনবি। অতি বুদ্ধিমান একজন মানুষের সঙ্গে তোর পরিচয় হবে। তার সাহায্য চাইবি।

বুঝব কী করে সে অতি বুদ্ধিমান?

তাকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করবি! দেখবি ধাঁধার জবাব দিতে পারে কি না। প্রথম শুরু করবি সহজ ধাঁধা দিয়ে তারপর কঠিনের দিকে যাবি। আপা এই ধাঁধাটা দিয়ে শুরু কর–

কহেন কবি কালিদাস

পথে যেতে যেতে
নাই তাই খাচ্ছ
থাকলে কোথায় পেতে?

ইথেন হাসছে। সে আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। হাসিখুশি গল্পবাজ মেয়ে। সে শব্দ করেই হাসছে। পাশের ঘরে নিশ্চয়ই সেই হাসির শব্দ পৌঁছেছে। বাবা এবং তার পীর সাহেব কোরান পাঠ বন্ধ করেছেন। বাবা উঠে আসছেন। তাঁরা পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ইথেন বলল, আপা যাই।

বাবা ঘরে ঢুকে ক্লান্ত গলায় বললেন, হাসছিস কেন মাঃ শরীর খারাপ লাগছে? মাথায় যন্ত্রণা? দুটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে থাক মা। তিনি আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। আমি কাঁদতে শুরু করেছি। কিন্তু আমার কান্নার শব্দ হাসির মতো শুনাচ্ছে।

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, তুই কঁদেছিলি? অথচ আমার কাছে মনে হচ্ছিল কেউ একজন হাসছে। বিপদে-আপদে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। কী শুনতে কী শোনে।

আমি বললাম, বাবা একটা কাজ করবে? আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাবে? আমি মর্গের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব।

বাবা বললেন, ঠিক হবে না রে মা।

আমি বললাম, কেন ঠিক হবে না? অবশ্যই ঠিক হবে। তোমার মেয়েটা একা পড়ে আছে। একা-একা ভয় পাচ্ছে।

বাবা বললেন, এত রাতে কীভাবে যাব?

আমি বললাম, রিকশা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর যদি না পাওয়া যায় আমরা হেঁটে যাঁবো!

বাবা বললেন, পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

আমি বললাম, ওনাকে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই বাবা। ওনার মেয়ে মর্গে পড়ে নেই। তোমার মেয়ে পড়ে আছে। বাবা তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর সে খুবই ভয় পাচ্ছে।

তুই ওখানে গিয়ে কী করবি?

আমি একটা জায়নামাজ নিয়ে যাব। মর্গের বারান্দায় জায়নামাজ বিছিয়ে সূরা ইয়াসিন পড়ব।

রাত তিনটায় আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে উপস্থিত হলাম। দারোয়ান গেট খুলে দিল। সে আমাদের দেখে মোটেই অবাক হল না। সে নিশ্চয়ই আমাদের মতো অনেককে এভাবে আসতে দেখেছে। সে সহজ স্বাভাবিক গলায় পশ্চিম কোনদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, অজুর পানি লাগব? আমি বললাম, আমার বোনের ডেডবডি মর্গে আছে। তাকে একনজর দেখা কি সম্ভবঃ দারোয়ান বলল, নিয়ম নাই। আমি বললাম, ভাই একটা খোঁজ নিয়ে দেখেন না সম্ভব কি না।

সুপারভাইজার সাব হুকুম দিলে তালা খুলতে পারি। কাছে যাইতে পারবেন না দূর থাইক্যা দেখবেন। তালা খুলনের জন্য খরচ দিবেন।

খরচ কত?

পাঁচ শ টেকা লাগব।

পাঁচ শ টাকা আমি দেব।

দেখি সুপারভাইজার সাব আছে কি না। উনার হুকুম বিনা পারব না। এক হাজার টাকা দিলেও পারব না। আমার চাকরি বিলা হয় যাইব।

বাবা জায়নামাজ বিছিয়ে সূরা ইয়াসিন পড়া শুরু করেছেন। তাঁর পীর সাহেব চোখ বন্ধ করে তসবি টানছেন। আমি অপেক্ষা করছি সুপারভাইজারের জন্য।

সুপারভাইজার সাহেবকে পাওয়া গেল। তিনি চাবি হাতে দরজা খুলে দিতে এলেন। আমি পাঁচ শ টাকার একটা নোট তার হাতে দিলাম। তিনি বললেন, আরো দুই শ লাগবে। আমার পাঁচ শ দারোয়ানের দুই শ।

আমি আরো দুশ টাকা দিলাম। সুপারভাইজার সাহেবের সঙ্গে মর্গে ঢুকলাম। মর্গে এক শ পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। মর্গে তিনটা ডেডবডি। তিনটাই তিনটা আলাদাআলাদা টেবিলের উপর। প্রতিটা ডেডবডি সাদা কাপড়ে ঢাকা! ইথেন বলেছিল তাকে রাখা হয়েছে একটা বাক্সের ভেতর এটা ঠিক না। ঘরের ভেতর ফিনাইলের কড়া গন্ধ।

সুপারভাইজার বললেন, ইথেন আছে মাঝখানের টেবিলে।

আমি চমকে সুপারভাইজারের দিকে তাকলাম। ইথেন নাম সুপারভাইজারের জানার কথা না। আমি চাপা গলায় বললাম, আপনি কে?

সুপারভাইজারের ঠোঁটের কোণে হাসি। আমি বললাম, আপনি কে?

বোনকে দেখতে আসছেন দেখেন। এত প্রশ্ন কী জন্য? তবে না দেখলে ভালো করবেন।

আপনি কে?

আমি তোমার স্যার। আমার নাম রকিব। আমি তোমার সঙ্গে ঘষাঘষি খেলা খেলতাম। এখন চিনেছ?

হ্যাঁ চিনেছি।

মরা মানুষের সাথে আমার কোনো ব্যবসা নাই! আমার ব্যবসা জীবিত মানুষের সাথে তারপরেও তোমার খাতিরে আসছি। বোনকে দেখার যখন এত শখ তখন দেখ।

এই সময় একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটল। সাদা চাদরের ভেতর থেকে ইথেন বলল, আপা খবরদার আমাকে দেখিস না। খবরদার না।

আমি অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমি ইথেনের বিছানায় শুয়ে আছি! আমার গায়ে চান্দর। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। পাশের ঘর থেকে

বাবার সুরা ইয়াসিন পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাবার পীর সাহেব একমনে জিগির করছেন। হাসপাতালের মর্গে আমার যাওয়া, ইবলিশের সঙ্গে দেখা হওয়া, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া, সবই আমার কল্পনা কিংবা স্বপ্ন।

এখানেও সামান্য সমস্যা আছে। সামান্য সমস্যা বলা ঠিক হবে না বেশ বড় সমস্যা। হাসপাতালের মর্গে আমি বাবাকে নিয়ে পরদিন তোরে যাই। যে দারোয়ানকে রাতে দেখেছিলাম। তাকেই দেখি। সে ঠিক রাতে যেরকম বলেছে সেইভাবে বলেসুপারভাইজার সাব হুকুম দিলে তালা খুলতে পারি। কাছে। যাইতে পারবেন না। দূর থাইকা দেখবেন। তালা খুলনের জন্য খরচ দিবেন।

আমি বললাম, খরচ কত?

সে বলল, পাঁচ শ টাকা।

সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা হল। রাতে আমি এই মানুষটাকেই দেখেছিলাম। তালা খোলার পর সে বাড়তি দুশ টাকা নিল।

রাতে আমি একা মর্গে ঢুকেছিলাম। দিনে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলাম। মর্গের দৃশ্যও রাতের দৃশ্যের মতো। ছোট-ছোট তিনটা টেবিলে তিনটা ডেডবডি পড়ে আছে। সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। বাবা চাপা গলায় বললেন, কোনটা আমার মেয়ে?

সুপারভাইজার বিরক্ত গলায় বলল, মাঝখানেরটা। আপনার কাছে যাবেন না। যেখানে দাঁড়ায়ে আছেন সেখানে দাঁড়ায়ে থাকেন। আমি চাদর খুলে মুখ দেখায়ে দিতেছি। তাড়াতাড়ি বিদায় হন। রিপোর্টিং হয়ে গেলে চাকরি যাবে।

আগে একবার লিখেছি পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে ইথেনের গর্ভে কোনো সন্তান ছিল এমন কিছুই পাওয়া যায় নি। শুধু লেখা ছিল—উচ্চ স্থান হইতে পতন জনিত কারণে মৃত্যু। কোথায় কোথায় আঘাত লেগেছে তার বর্ণনা। তা হলে ইথেন এই কাজটা কোন করল? কোন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল? সে কি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল? সে কি ধরে নিয়েছিল সে প্রেগনেন্ট? মনোবিদ্যায় এরকম রোগের উল্লেখ আছে।

আমি ইথেনকে নিয়ে এরকম একটা ছবি দেখেছিলাম। ছবির নাম The Yellow Snake, সেই ছবিতে এক মহিলার হঠাৎ ধারণা হল তিনি প্রোগনেন্ট। তার ভেতর প্রোগনেসির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হল। ডাক্তারের কাছে ইউরিন টেস্ট করালেন। সেই টেস্ট্রেও পজিটিভ পাওয়া গেল। তখন মহিলা স্বপ্নে দেখলেন তাঁর পেটে যে সন্তান এসেছে সে কোনো মানবশিশু না। একটা সাপ। ভয়াবহ ছবি।

ইথেনের কি একই সমস্যা ছিল? ভুক্তির পেটে সন্তান এই বিষয়ে সে যে নিশ্চিত ছিল তার একটা প্রমাণ আমার কাছে আছে। সে তার সন্তানকে একটি চিঠিও লিখে রেখে গিয়েছিল। চিঠিটা আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

প্রিয় HCHO,

হ্যালো। তোমার নাম পছন্দ হয়েছে? ফরম্যালডিহাইড়। আমি তোমার মা আমার নাম ইথেন। আমি সাধারণ হাইড্রোকার্বন। অথচ তুমি হলে সুপার রিঅ্যাকটিভ ফরমালডিহাইড। পানিতে যদি ইথেন ছেড়ে দাও পানির কিছুই হবে না। পানি পানির মতো থাকবে। ইথেন থাকবে ইথেনের মতো। আর যদি পানিতে ফরমালডিহাইড ছাড়া-কত না কাণ্ড হবে।

তুমি পৃথিবীতে আসবে কত না কাণ্ড ঘটানোর জন্য। আফসোস তোমার এই কত না কাণ্ড দেখার সুযোগ আমার হবে না। কারণ আমি বেঁচে থাকব না।

ইতি তোমার মা।

মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত এগারোটা দশ।

তাঁর খাটের মাথায় নাসরিন বই-খাতা নিয়ে বসেছে। মিসির আলি যখন পড়েন। সেও তখন পড়ে। মিসির আলি আঁকে এর মধ্যেই বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছোট শব্দ সে এখন পড়তে পারে। লেখাপড়া শেখার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ মিসির আলিকে মুগ্ধ করেছে।

নাসরিন বলল, খালুজান চা খাবেন? চা বানাব?

মিসির আলি বললেন, চা এক কাপ খাওয়া যেতে পারে।

নাসরিনের চোখে-মুখে আনন্দের আভাস দেখা গেল। এই মানুষটার জন্য যে কোনো কাজ করতে পারলেই তার ভালো লাগে।

নাসরিন।

জি খালুজান।

তোমার বুদ্ধি কেমন নাসরিন?

বুদ্ধি ভালো খালুজান।

কেমন বুদ্ধি পরীক্ষা হয়ে যাক। একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব দেখি জবাব দিতে পার কি না।

কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে
নাই তাই খাচ্ছ
থাকলে কোথায় পেতে?

পারব না খালুজান।

তা হলে তো বুদ্ধি কম। আমি নিজেও পারছি না। আমারও তোমার মতোই বুদ্ধি কম।

নাসরিন গম্ভীর গলায় বলল, বুদ্ধি কম থাকন ভালো খালুজান।

মিসির আলি বললেন, বুদ্ধি কম থাকা মোটেই ভালো না। মানুষের বুদ্ধি হওয়া উচিত ক্ষুরের মতো।

ক্ষুরের মতো বুদ্ধি করে বলে?

ক্ষুরে যেমন ধার থাকে বুদ্ধিতেও থাকবে সেরকম ধার। যেমন সায়রা বানু। তোমার কি মনে হয় মেয়েটার বুদ্ধি বেশি না?

উনার বুদ্ধি খুবই ভালো কিন্তু উনার মাথাত গণ্ডগোল আছে। উনারে আমি বেজায় ভয় পাই।

কেন?

উনি রাইতে কেমন জানি করে। ঘুমায় না। কার সাথি যেন কথা কয়। পুরুষের মতো গলায় কথা কয়।

তুমি জান কীভাবে?

প্রথমে আমি উনার ঘরেই ঘুমাইতাম। আপা থাকে একা। উনার ঘরের মেঝেতে কম্বলের একটা বিছানা ছিল আমার জন্য। শেষে অ্যাপারে বলেছি আমি এইখানে থাকব না। আমার ভয় লাগে। তখন আপা আমারে অন্য ঘরে পাঠায়ে দিয়েছিল।

সায়রা মাঝে মাঝে পুরুষের গলায় কথা বলত?

জি।

কী বলত?

কী বলত জানি না। ইংরেজিতে কথা বলত। খালুজান আমারে ইংরেজি পড়া শিখাইবেন?

অবশ্যই শিখাব। তার আগে আসি চেষ্টা করে দেখি দুজনে মিলে ধাঁধার অর্থ বের করতে পারি কি না। কাহেন কবি কালিদাস ... এই বাক্যটার কি কোনো রহস্য আছে? তিনটা শব্দই শুরু হয়েছে ক দিয়ে। কয়ের অনুপ্রাস। তিনটা ক। অঙ্কের কোনো ধাঁধা না তো?

খালুজান কালিদাস কে?

কালিদাস ছিলেন বিরাট কবি। মেঘদূত, শকুন্তলা এই রকম ছয়টা অতি বিখ্যাত কবিতার বই লিখেছিলেন। উনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি। বিক্রমাদিত্যের আরেক নাম দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। বিক্রমাদিত্য নিজে ছিলেন পিশাচসিদ্ধ। একবার এক পিশাচ তাকে তিনটা প্রশ্ন করেছিল। পিশাচ বলেছিল এই তিনটা প্রশ্নের কোনো একটার জবাব ভুল দিলে আমি তোমাকে হত্যা করব। আর যদি তিনটা প্রশ্নেরই সঠিক জবাব দিতে পার আমি তোমাতে বশ হব। বিক্রমাদিত্য তিনটা প্রশ্নেরই জবাব দিতে পেরেছিলেন।

প্রশ্নগুলি কী খালুজান?

প্রশ্নগুলি এই মুহূর্তে মনে নাই। এইটুক মনে আছে প্রশ্নগুলি ছিল রহস্যময়। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের উত্তর ছিল সহজ-সরল।

নাসরিন গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, পিশাচ আপনেরে প্রশ্ন করলে পার পাইব না। আপনে পারবেন।

৬. সায়রা বানু এবং মিসির আলি

সায়রা বানু এবং মিসির আলি মুখোমুখি বসেছেন। সায়রা বানু তার রকিং-চেয়ারে। একটু আগে সে দুলছিল এখন দুলছে না। তার চোখের দৃষ্টি স্থির। ব্রক্ষ সামান্য কুঁচকে আছে। তাকে কোনো একটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত মনে হচ্ছে। আজ তাকে খানিকটা অসুস্থও মনে হচ্ছে। টেনে–টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এক ফাঁকে সে তার পাশে রাখা ব্যাগ থেকে ইনহেলারের শিশি হাতে নিল। দুবার পাফ নিল। মেয়েটির কি অ্যাজমা আছে? অ্যাজমা একটি সাইকো সমেটিক ব্যাধি। মনের ঝামেলা থেকে এই রোগ হয়। বেশ কষ্টকর ব্যাধি। মিসির আলি লক্ষ করলেন মেয়েটা দুলতে শুরু করেছে। সম্ভবত ইনহেলারে পাফ নেবার পর তার একটু ভালো লাগছে। সায়রা বলল, চাচা আজ যে বিশেষ একটা দিন সে বিষয়ে আপনি জানেন?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, বিশেষ কী দিন বলে তো?

আপনি জানেন না?

জানি না!

আমার হাতে চায়ের কাপ দেখেও বুঝতে পারছেন না?

না।

আপনার কাজের মেয়ে যে নতুন শাড়ি পরেছে এটা চোখে পড়ে নি?

শাড়ি তো সে মাঝে মাঝে পরে। আজ নতুন শাড়ি পরেছে এটা খেয়াল করি নি।

সায়রা হাসিমুখে বলল, চাচা আজ ঈদ। ঈদ বলেই আপনার এখানে দিনের বেলা উপস্থিত হয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসেছি। রমজান মাসের সকালে নিশ্চয়ই চা খেতাম না। আজ আমি এসেছি আপনাকে সালাম করতে।

মিসির আলি বিব্রত গলায় বললেন, দীর্ঘদিন তেমনভাবে কোনো উৎসব পালন করা হয় না বলে বিষয়টা আমার মাথায় থাকে না।

ছোটবেলায় ঈদ করতেন না?

অবশ্যই করতাম। নতুন জামা, জুতা। ঈদের আগের রাতে নতুন জুতা বালিশের কাছে রেখে ঘুমাতাম। নাকে লগত চামড়ার গন্ধ। এখনো আমার কাছে ঈদ মানে নাকে চামড়ার গন্ধ।

সায়রা বলল, আমি আপনার জন্য নতুন পাঞ্জাবি এনেছি। নাসরিনকে বলেছি পানি গরম করতে! আপনি গোসল করবেন। নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরবেন। ফিরনি খাবেন। আমি আপনাকে সালাম করে চলে যাব। একা যাব না। আপনাকে সঙ্গে করেই যাব। আপনাকে ঈদগায় নামিয়ে দেব।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাকে ঈদের নামাজ পড়তে হবে?

হ্যাঁ হবে। আমার এই জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে ঈদের দিন জয়নামাজ বগলে নিয়ে বাবা ঈদের নামাজে যাচ্ছেন। আমরা দুই বোন তাড়াহুড়া করে সেমাই ফিরনি এইসব রাধছি। আমরা দুই দফা বাবাকে সালাম করতাম। একবার উনি যখন নামাজে যেতেন তখন। আরেকবার উনি যখন নামাজ থেকে ফিরে আসতেন তখন।

মিসির আলি বললেন, সালাম কি দুবার করতে হয়?

সায়রা বলল, একবারই করার নিয়ম। দুবার সালামের ব্যাপারটা ইথেন চালু করে। ওর অনেক পাগলামি ছিল। দুইবার সালামের সে নামও দিয়েছিল-যাওয়া সালাম, আসা সালাম। চাচা। আপনি এখনো বসে আছেন। যান গোসল করতে যান।

মিসির আলি বললেন, গোসল, নতুন কাপড় পরা, ঈদগায়ে যাওয়া এই অংশগুলি বাদ দিলে কি হয় না?

সায়রা বলল, হয়। কেন হবে না। তবে আমার একটা ধারণা ছিল আপনি আমার কথা শুনবেন। আমি ঠিকমতো আপনাকে বলতে পারি নি। আরো আবেগ দিয়ে যদি অনুরোধটা করতাম তা হলে অবশ্যই আপনি শুনতেন।

মিসির আলি বললেন, তুমি তো যথেষ্ট আবেগ দিয়েই কথাটা বলেছ। এরচেয়ে বেশি আবেগ দিয়ে কীভাবে বলতে?

সায়রা বলল, শৈশবের ঈদের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে যদি টপটপ করে চোখের পানি পড়ত তা হলে আপনি আমার কথায় রাজি হয়ে যেতেন। আপনি কাজ করেন। লজিক নিয়ে কিন্তু আপনার মধ্যে আবেগ অনেক বেশি।

কথা বলতে—বলতে সায়রার হঠাৎ গলা ধরে গেল। সে তার মাথা সামান্য নিচু করল। মিসির আলি সায়রার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন! সায়রার চেখভর্তি পানি টলমল করছে। বোরকার একটা অংশ সে দু চোখের উপর চেপে ধরল। তার শরীর সামান্য কঁপিল। মিসির আলি বললেন, তুমি আরেক কাপ চা খাও। চা খেতে খেতে আমি গোসল সেরে চলে আসব। আমার জন্য কী পাঞ্জাবি এনেছ দাও পরে ফেলি।

সায়রা চোখ থেকে কাপড় সরিয়ে হেসে ফেলে বলল, আমার যে চোখের পানি আপনি দেখেছেন সেটা আসল না, নকল। চোখের পানি দিয়ে যে আপনার সিদ্ধান্ত পাস্টানো যায় সেটা দেখাবার জন্য কাজটা করেছি। আমি আগেও আপনাকে একবার বলেছি যে আমি দ্রুত চোখের পানি আনতে পারি। বলি নি?

হুঁ বলেছ।

আমি যে একজন এক্সপার্ট অভিনেত্রী এটা বুঝতে পারছেন?

হুঁ।

ইথেন ছিল আমার চেয়েও এক্সপার্ট। সে যে কোনো মানুষের গলা নকল করতে পারত। তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে আপনি খুব মজা পেতেন।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। গোসল সারবেন ভেবেই উঠে দাঁড়ানো। সায়রা বলল, আপনাকে গোসল করতে হবে না। নতুন পাঞ্জাবিও পরতে হবে না। আপনার অভ্যস্ত জীবন থেকে আমি আপনাকে সরাব না। তবে ঈদ উপলক্ষে আপনাকে নিয়ে চা অবশ্যই খাব। নাসরিনকে চা দিতে বলি?

বলো।

আমি আজ যাওয়ার সময় নাসরিনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ঈদ উপলক্ষে আমার বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ হইচই করবে। দরিদ্র মানুষের জন্য ঈদের উৎসব অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। চাচা আমি কি ঠিক বলেছি?

বুঝতে পারছি না ঠিক কি না। তবে তোমার লজিক ভালো। তুমি যা বলবে ভেবেচিন্তেই বলবে এটা ধরে নেওয়া যায়।

নাসরিন চা নিয়ে এসেছে। সায়রা মাথা নিচু করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। মিসির আলি সিগারেট ধরিয়েছেন। একটা ছোট্ট প্রশ্ন তাঁর মাথায় এসেছে প্রশ্নটা করবেন কি না। বুঝতে পারছেন না। আজকের উৎসবের দিন কঠিন প্রশ্নের জন্য হয়তো উপযুক্ত না। প্রশ্নটা দুই বোনের ইবলিশ শয়তান দেখা নিয়ে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে এরা ইবলিশকে দেখেছে। অথচ সময় মিলছে না। পুরো লেখাতেই সময়ের গণ্ডগোল থেকেই যাচ্ছে। সায়রা খাতায় লিখছে সে শ্রাবণ মাসের রাতে ইবলিশ শয়তানের দেখা পায় কিংবা স্বপ্নে দেখে। তার কয়েকদিন পরেই ছাদে দুই বোনের চা খাওয়ার বর্ণনা আছে। তখন বাগান বিলাসের রঙিন ঝলমলে পাতার কথা আছে। শ্রাবণ মাসে বাগান বিলাসের রঙিন পাতা থাকবে না। বেলি ফুলের

গাছে বেলি ফুল থাকবে। অথচ সায়রা পরিষ্কার লিখল বেলি ফুলের সিজন না। ইবলিশ শয়তানের দেখা যদি তারা পেয়েও থাকে কে আগে পেয়েছে?

সায়রা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান। আপনার চোখে প্রশ্ন প্রশ্ন ভাব আছে। প্রশ্ন করতে চাইলে করতে পারেন।

কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি না।

আপনি আমার লেখা কতটুকু পড়েছেন?

সেকেন্ড চ্যাপ্টার শেষ করেছি।

প্রথম চ্যাপ্টার শেষ করার পরে আপনার মধ্যে অনেক খটকা তৈরি হয়েছিল। সেকেন্ড চ্যাপ্টারে হয় নি?

তেমন বড় কোনো খটকা তৈরি হয় নি। ছোটখাটো কিছু সমস্যা আছে সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না।

সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্যই পান নি?

মিসির আলি বললেন, একটা পেয়েছি তোমাদের ইবলিশ শয়তান বিরাট মিথ্যাবাদী। সে সত্যির সঙ্গে মিথ্যা মিশাচ্ছে না। মিথ্যার সঙ্গেই মিথ্যা মিশাচ্ছে। তোমার মা মোটেই হিন্দু মহিলা ছিলেন না। তার নাম রহিমা বেগম। তোমার বাবা সংক্ষেপ করে রমা ডাকতেন।

সায়রা শান্ত গলায় বলল, এই তথ্য আমি আমার খাতার কোথাও লিখি নি। আপনি কোথায় পেয়েছেন?

মিসির আলি দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললেন, আমার এক ছাত্র বগুড়া আযিযুল হক কলেজে অধ্যাপনা করে। তাকে চিঠি লিখে বিষয়টা জানাতে বলেছিলাম। সে চিঠিতে জানিয়েছে।

সায়রা বলল, আমি কি চিঠিটা পড়তে পারি?

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই পার। তিনি চিঠি এনে দিলেন। চিঠিতে লেখা—

শ্রদ্ধেয় স্যার,
আসসালাম। আমি আপনার চিঠি পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি। আপনি যে আমার নাম মনে রেখেছেন এই আনন্দই আমার রাখার জায়গা নাই। আমার কথাটা আপনি বাড়াবাড়ি হিসাবে নেবেন না। আপনার সকল ছাত্রছাত্রী যে আপনাকে কোন চোখে দেখে তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।

যাই হোক এখন মূল প্রসঙ্গে আসি। আপনার চিঠি যেদিন পাই সেদিনই আমি সারিয়াকান্দি রওনা হই। বগুড়া জেলায় তিনটি সারিয়াকান্দি আছে। ভাগ্যগুণে প্রথম গ্রামটিতেই কেমিস্ট্রির টিচার হাবিবুর রহমান সাহেবের স্ত্রীর কবরের সন্ধান পাই। মহিলার নাম রহিমা

বেগম। তাঁর পিতা সারিয়াকান্দি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এখন মৃত। মেয়ের কবরের পাশেই তাঁর কবর হয়েছে।

স্যার, এর বাইরেও যদি আপনি কিছু জানতে চান আমাকে জানাবেন। আমি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেব।

আপনার শরীরের যত্ন নেবেন। যদি অনুমতি পাই তা হলে ঢাকায় এসে আপনাকে কদমবুসি করে যাব।

ইতি
আপনার স্নেহধন্য
ফজলুল করিম
বগুড়া আফিফুল হক কলেজ, বগুড়া।

সায়রা চিঠি ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, আপনার অনুসন্ধানের এই প্যাটার্নটা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না। আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার লেখা পড়ে চিন্তা করতে করতে মূল সমস্যার সমাধানে যাবেন! আপনি যে আবার চিঠিপত্র লিখে অন্যখান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করবেন তা ভাবি নি।

মিসির আলি বললেন, তোমার নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি নেই?

সায়রা বলল, আপত্তি আছে। আপনার যা জানার আমার কাছে জানবেন। I will answer you truthfully, বাইরের কাউকে কিছু জানাতে পারবেন না!

ঠিক আছে।

সায়রা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি এখন চলে যাব। আপনি কি আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু জানতে চান?

মিসির আলি বললেন, তোমাদের বাড়ির ইলেকট্রিসিটি বিলগুলি দেখতে চাই। তুমি যেমন গোছানো মেয়ে আমার ধারণা পুরোনো সব ইলেকট্রসিটি বিলই তোমাদের কাছে আছে।

আপনার কি সব বিল দরকার?

হ্যাঁ সবই দরকার।

আমি বিল পাঠিয়ে দেব।

সায়রা দ্রুত ঘর থেকে বের হল। নাসরিনকে তার সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কথা। সে নিল না। মনে হয় ভুলে গেছে।

সে আরো একটা ব্যাপার ভুলে গেছে-মিসির আলিকে ঈদের সালাম। সে বলেছিল এ বাড়িতে তার আসার উদ্দেশ্য মিসির আলিকে সালাম করা। কোনো কারণে সায়রা অবশ্যই আপসেট। ফজলুল করিমের লেখা চিঠিটা কি কারণ হতে পারে? মিসির আলি ঠিক ধরতে পারছেন না।

ঈদের দিনটা নাসরিনের বৃথা গেল না। মিসির আলি তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হলেন। বাচ্চা একটা মেয়ে নতুন শাড়ি পরে ঈদের দিনে ঘরে বসে থাকবে এটা কেমন কথা? তিনি তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গেলেন। নাসরিন আগে কখনো চিড়িয়াখানায় আসে নি, সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। সে হাতিতে চড়ল। আইসক্রিম খেল চারটা। বানরের খাঁচার সামনে থেকে তাকে নড়ানোই যায় না। মিসির আলি বললেন, মজা পাচ্ছিস নাকিরে মা? নাসরিন বলল, হুঁ।

সন্ধ্যার দিকে তারা যখন ফিরছে। বের হবার গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে তখন নাসরিন ফিসফিস করে জানাল সে আরেকবার জলহস্তী দেখতে চায়। মিসির আলি হাসিমুখে তাকে জলহস্তী দেখাতে নিয়ে গেলেন।

রাতে নাসরিনকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন হোটেলের মালিক হারুন বেপারীর বাসায়। হারুন বেপারী আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। সে চোখ কপালে তুলে বলল, আপনি আসছেন এটা কেমন কথা?

মিসির আলি বললেন, ঈদের দিন বেড়াতে আসব না!

হারুন বেপারী বলল, অবশ্যই আসবেন! আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন। এটা যে আমার জন্য কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার সেইটা আমি জানি। ঠিকানা পাইলেন কই?

আপনার হোটেলে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা ছেলের কাছ থেকে যোগাড় করেছি।

হারুন বেপারী খাওয়াদাওয়ার বিপুল আয়োজন করল। শুধু খাওয়াদাওয়া না রাতে তাদের সঙ্গে সেকেন্ড শো সিনেমা দেখতে যেতে হল। গত পাঁচ বছর থেকে নাকি সে প্রতি দুই ঈদের রাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে।

মিসির আলি সিনেমা দেখার অংশ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। ক্ষীণ গলায় ছিলেন। ঈদের দিন সিনেমা দেখাটা আপনাদের পরিবারের ব্যাপার সেখানে আমি ঠিক...।

হারুন বেপারী কঠিন গলায় বলল, যে বলে আপনি আমার পরিবারের লোক না তার গালে যদি জুতা দিয়া দুই বাড়ি আমি না দিছি তা হলে আমার নাম হারুন বেপারী না।

ছবি দেখে মিসির আলি যথেষ্টই মজা পেলেন। ছবির নাম জিদ্দি সন্ত্রাসী। সেখানে একজন ভয়ংকর সন্ত্রাসীর প্রেম হয় কোটিপতির একমাত্র কন্যা চামেলীর সঙ্গে। খবর জানতে পেরে চামেলীর বাবা শিল্পপতি ওসমান সন্ত্রাসীকে জীবিত অথবা মৃত ধরার জন্য দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। চামেলী একদিন সন্ত্রাসীকে নাম রাজা) বাবার সামনে উপস্থিত করে বলে–দাও এখন পুরস্কারের দশ লক্ষ টাকা। এই টাকা আমি দরিদ্র জনগণকে দান করব। এদিকে জানা যায় সন্ত্রাসীও আসলে সন্ত্রাসী না। সেও আরেক কোটিপতি এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির একমাত্র সন্তান। তাকে শিশু অবস্থায় চুরি করে নিয়ে যায় এক বেদের দল। সেই বেদের দলের এক ষোড়শী কন্যার সঙ্গে রাজার বিয়ে ঠিকঠাক হয়। বিয়ের রাতে জানা যায়। এই বেদেনি কন্যা (তার নামও আবার কাকতালীয়ভাবে চামেলী) আসল মানুষ নয়, সে নাগিন। ইচ্ছামতো সে মানুষের বেশ ধরতে পারে আবার সাপও হয়ে যেতে পারে। নাগরাজের সঙ্গে তার বিরোধ বলেই সে লুকিয়ে বেদেনি কন্যা সেজে মনুষ্য সমাজে বাস করে।

মিসির আলির পুরো সময়টা কাটল কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক এটা চিন্তা করে বের করতে। কোন চামেলী আসলে নাগিন কন্যা এটা নিয়ে তিনি খুবই ঝামেলায় পড়লেন। নাসরিনকে বারবার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে, এই চামেলী কি আসলে নাগিন নাকি সে আসল মানুষ? বেদে দলের সর্দার এবং নাগরাজ কি একই ব্যক্তি নাকি আলাদা।

শেষ দৃশ্যে নাগরাজ এবং নাগিন কন্যার একই সময়ে মৃত্যু হল। দুজনই সাপ হয়ে একজন আরেকজনকে দংশন করল। ভয়াবহ জটিলতা।

ছবি দেখে ফেরার পথে নাসরিন ঘোষণা করল সে তার সমগ্র জীবনে দুজন সত্যিকার ভালোমানুষ দেখেছে। দুজনকেই সে খালুজান ডাকে।

মিসির আলি বললেন, একজন যে আমি এটা বুঝতে পারছি। আরেকজন কে?

নাসরিন বলল, আরেকজন সায়রা আপামণির বাবা। উনার নাম হাবিবুর রহমান।

মিসির আলি বললেন দুজনের মধ্যে কে বেশি ভালো? ফার্স্ট কে সেকেন্ড কে? নাসরিন গাঢ় গলায় বলল, উনি ফার্স্ট।

মিসির আলি বাসায় ফিরলেন রাত বারোটায়।

গাড়ির ড্রাইভার বিরক্ত গলায় বলল, আপনি কই ছিলেন? রাত নটার সময় এসেছি এখন বাজে ঘারোটা।

বড়লোকদের ড্রাইভারের মেজাজ থাকে। এমনিতেই চড়া। ঈদের দিনে সেই চড়াভাব হয় তুঙ্গস্পর্শী। মিসির আলি বললেন, কোনো সমস্যা?

ড্রাইভার বলল, সমস্যাটমস্যা জানি না। আপনের জন্য খাবার পাঠিয়েছে। নিয়ে ানা!

মিসির আলি বললেন, আমরা খাওয়াদাওয়া করে ফেলেছি। খাবার দিতে হবে না।

ড্রাইভার বলল, খাবার প্রয়োজন হলে নর্দমায় ফেলে দেন আমি এইগুলা নিয়ে ফিরত যাব না। আপনার জন্য ম্যাডাম একটা চিঠিও পাঠিয়েছেন।

মিসির আলি চিঠি এবং খাবার নিয়ে বাসায় ফিরলেন। চিঠিতে সায়রা লিখেছে। (বাংলায় লেখা চিঠি।

চাচা,
এই চিঠি ক্ষমাপ্রার্থনা মূলক। আমি আজ ঈদের দিনে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। ঈদের সালাম করতে গিয়ে হঠাৎ রাগ দেখিয়ে চলে এসেছি। সালামও করা হয় নি।

আমার রাগের কারণটা অবশ্যই আপনার কাছে পরিষ্কার। আমি চাচ্ছিলাম না। আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয়ের কোনো একটি বাইরের কেউ জানুক। আমার রাগ করাটা ঠিক হয় নি। কারণ আপনাকে আমি একটি সমস্যা সমাধানের জন্য কমিশন করেছি। সেই সমস্যা সমাধানূর জন্য আপনি যা যা করার সব করবেন। এটাই তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া আমি তো আগেভাগে আপনাকে বলি নি যে আপনি বাইরের কাউকে যুক্ত করতে পারবেন না।

চাচা। আপনি যাকে ইচ্ছা যা কিছু ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পারেন। আপনাকে ফ্রি পাস দেওয়া হল।

আপনার জন্য কিছু খাবার পাঠালাম। কোনো রান্নাই আমার না। বাবুর্চি রান্না করেছে। কোনো একদিন আমি নিজে রান্না করব এবং আপনাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াব। আমি কেমিস্ট্রির ছাত্রী। কেমিস্ট্রির ছাত্রছাত্রীরা ভালো রাধুনি হয় এটা কি জানেন? কারো রান্না ভালো হয়। কারো রান্না খারাপ হয়। কেন হয় সেটা কেমিষ্ট্রির পয়েন্ট অব ভিউ থেকে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। আমার ধারণা আপনার ভালো লাগবে।

আমার বাবা কেমিষ্ট্রির শিক্ষক বলেই বোধ হয় ওনার রান্নার হাত অসাধারণ। মার মৃত্যুর পর প্রায়ই এমন হয়েছে যে ঘরে কাজের লোক নেই। রান্না করতে হচ্ছে তাও একদিন দুদিন না। দিনের-পর-দিন। বাবা সবচেয়ে ভালো রাধেন মটরশুঁটি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল এবং করলা দিয়ে চিংড়ি মাছ।

আপনি একদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমি ব্যবস্থা করব। যেদিন আসবেন বাবার হাতের রান্না খাবেন।

চিঠিটা দীর্ঘ হয়ে গেল। কেন দীর্ঘ হল শুনলে আপনার হয়তোবা সামান্য মন খারাপ হবে। আমার অ্যাজমার টান উঠেছে। কিছুক্ষণ আগে নেবুলাইজার ব্যবহার করেছি। তাতে লাভ হয় নি। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। যখন শ্বাসকষ্ট হয় তখন যদি প্রিয় কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখি তা হলে কষ্টটা কম হয়। আপনার কাছে চিঠি লেখার ব্যাপারটা যতক্ষণ ততক্ষণ শ্বাসকষ্ট টের পাচ্ছি না।

চাচা। আপনি ভালো থাকবেন। ও আচ্ছা। আপনাকে একটি বিশেষ থ্যাংকস। চিঠির শুরুতেই দিতে চেয়েছিলাম ভুলে গেছি। এখন দিয়ে দেই। আপনি যে কাজের মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এটা আমার ভালো লেগেছে। মেয়েটি অতি ভালো। তাকে রাখা হয়েছিল বাবার সেবার জন্য বাবাও মেয়েটিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু আমাদের কারোরই মনে হয় নি এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শেখানো যায়। আপনার মনে হয়েছে। এই সব আপাত তুচ্ছ কর্মকাণ্ড দিয়েই কিন্তু একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

বিনীত
সায়রা বানু।

৭. প্রফেসর সরদার আমিন হোসেন

স্কটল্যান্ডের এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজির ফুল প্রফেসর সরদার আমিন হোসেন মিসির আলিকে একটি চিঠি কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়েছেন। চিঠিটা এরকম।

শ্রদ্ধেয় স্যার,
আমার সালাম নিন। আপনার চিঠির জবাব দিতে কিছু দেরি করে ফেললাম। তার জন্য শুরুতেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মনোবিদ্যার একটি কনফারেন্স চলছিল। আমি ছিলাম প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরদের একজন।

স্যার আপনার চিঠি পড়ে মন সামান্য খারাপ হয়েছে। আপনি আবারো কোনো রহস্য সমাধানে নেমেছেন বলে মনে হয়েছে। আপনি আপনার ক্ষমতার কোনো ব্যবহারই করলেন না। ক্ষমতা নষ্ট করলেন তৃতীয় শ্রেণীর সব রহস্য সমাধান করতে গিয়ে। রহস্য সমাধান করবে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ। আপনি না। আপনি আপনার মূল কাজটা করবেন। আমরা যারা আপনার ছাত্র তারা সবাই আপনার কথা ভেবে দুঃখ পাই। মানসিক চিন্তার ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত। এই ক্ষমতার হাস্যকর ব্যবহার অপরাধের মধ্যে পড়ে।

স্যার আমার কঠিন কথাগুলি ক্ষমা করবেন। এখন আপনি যা জানতে চাচ্ছেন জানাচ্ছি।

সায়রা বানু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই রসায়নশাস্ত্রে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি নিয়েছে। তার থিসিসের বিষয় ছিল-কলয়েড সায়েন্স। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি সে ছাত্রী হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিল। ডিগ্রি প্রাপ্তির পরপরই তাকে এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারশিপের অফার দেওয়া হয়েছিল। সে সেই অফার গ্রহণ করে নি।

আপনি মেয়েটির মানসিক অবস্থা কেমন ছিল জানতে চেয়েছেন। আমি তার সুপারভাইজার ড. জন গ্রিনের সঙ্গে কথা বলেছি। ড. জন গ্রিন জানিয়েছেন তার এই ছাত্রীর মধ্যে তিনি কখনো মানসিক কোনো সমস্যা দেখেন নি।

সায়রা বানু ক্যাম্পাসে থাকত না। সে ক্যাম্পাসের বাইরে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকত। পড়াশোনার শেষের দিকে সে তার বাবাকে নিয়ে আসে। তার বাবার নাম হাবিবুর রহমান। তিনিও একসময় রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন। তারা যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকত। তার বাড়িওয়ালী মিসেস স্টোনের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। ইউরোপ আমেরিকার বৃদ্ধ বাড়িওয়ালীদের কোনো কথাই গুরুত্বের সঙ্গে ধরা ঠিক না। এরা কর্মহীন জীবনযাপন করে এবং তাদের টেনেন্টদের সম্পর্কে নানাবিধ গল্পগাথা তৈরি করতে পছন্দ করে। এ বিষয়ে আমার নিজেরই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

যাই হোক বুড়ি মিসেস স্টোন আমাকে জানিয়েছে সায়রা বানু এবং তার বাবা দুজনের কেউই রাতে ঘুমাত না। সারা রাত গুনগুন করে গান করত। হাবিবুর রহমান ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। আমার ধারণা তিনি কোরান পাঠ করতেন। বুড়ি এটাকেই গান বলছে। এরা দুজন রাতে ঘুমাত না কথাটাও হাস্যকর। এই ধরনের বৃদ্ধারা সন্ধ্যারাতেই মদটদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যরা জেগে আছে না ঘুমাচ্ছে তা তাদের জানার কথা না। যে মেয়ে রসায়নশাস্ত্রের মতো একটি জটিল বিষয়ে Ph. D, থিসিস তৈরি করতে গিয়ে সারা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করছে সে সারা রাত জেগে থাকবে কীভাবে।

সায়রা বানু সম্পর্কে আপনাকে আরেকটি তথ্য দিতে পারি। এই তথ্য আপনার কাজে লাগতে পারে। নাট্যকলা বিষয়ে এই মেয়ের প্রবল আগ্রহ ছিল। সে পিএইচ. ডি. করার

ফাঁকে-ফাকে অভিনয়ের ওপর দুটি কোর্স করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রাম ক্লাব শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট নাটকটি মঞ্চায়ন করেছিল। টেম্পেস্টের মূল চরিত্র মিরান্ডার ভূমিকা তার করার কথা ছিল। দীর্ঘদিন সে মিরান্ড চরিত্রের জন্য রিহার্সেল করেছে। শেষ মুহূর্তে শারীরিক অসুস্থতার জন্য নাটকটি করতে পারেনি। তবে ব্রিটিশ ফিল্ম মেকার সিবেস্টিন জুনিয়ারের পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি The Ormer-এ ভারতীর মেয়ের একটি ছোট্ট ভূমিকায় সে অভিনয় করেছে। ছবিটি আমি দেখি নি। আমি ছবিটির একটি ডিভিডি কপি আপনার জন্য পাঠালাম। আমি জানি এই ডিভিডি দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ডিভিডি প্লেয়ার আপনার নেই। একটি ডিভিডি প্লেয়ারও পাঠালাম। প্রাক্তন ছাত্রের এই উপহার আপনি গ্রহণ করবেন। এই আশা অবশ্যই করতে পারি।

আপনি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলেন সায়রা বানু কোনো মানসিক রোগের ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল কি না। এই বিষয়ে আমি কোনো তথ্য বের করতে পারি নি। মানসিক রোগের ডাক্তাররা রোগীদের কোনো তথ্য বাইরে প্রকাশ করেন। না। তার জন্য কোর্টের নির্দেশ প্রয়োজন হয়।

স্যার আপনি যদি আরো কিছু জানতে চান আমি আমার ই-মেইল নাম্বার দিচ্ছি। চিঠি চালাচালির চেয়ে ই-মেইলে যোগাযোগ সহজ হবে।

বিনীত

৮. শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট থেকে কয়েকটা লাইন

কেমন আছ, সায়রা?

চাচা আমি ভালো আছি।

খুব ভালো আছ সেরকম মনে হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে দুবার ইনহেলার নিলে।

আমার মন ভালো না। যখন আমার মন খারাপ থাকে তখন শ্বাসের সমস্যা হয়।

মন খারাপ কেন?

আমার হাসবেন্ডের শরীর হঠাৎ বেশি খারাপ করেছে। কাল রাতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে চেয়েছিলাম। সে রাজি হয় নি। সে বলেছে জীবনের শেষ কিছুদিন সে তার নিজের বাড়িতে কাটাতে চায়।

উনি কি নিশ্চিত যে তাঁর জীবনের শেষ সময় এসে গেছে?

উনি নিশ্চিত না হলেও আমি নিশ্চিত।

এত নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছ? ইবলিশ শয়তান এসে তোমাকে বলেছে যে তিনি মারা যাচ্ছেন?

আমাকে বলে নি। বাবাকে এসে বলেছে।

সায়রা চা খাবে?

না।

চা খাও। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। এস কিছুক্ষণ মন খুলে গল্প করি। আমার ধারণা তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

দেখা হবে না কেন?

দেখা হবে না কারণ দেখা হবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি ইবলিশ শয়তানঘটিত যে-সমস্যা তার সমাধান করেছি। সমাধান জানার পর তুমি যে আমার কাছে আসবে তা মনে হয় না।

সমাধান করে ফেলেছেন?

হ্যাঁ করেছি।

আপনি কি আমার লেখা পুরোটা পড়েছেন?

আমি থার্ড চ্যাপ্টার পর্যন্ত পড়েছি।

আরো দুটা চ্যাপ্টার আছে। সেই দুই চ্যাপ্টার পড়বেন না?

না।

না কেন?

তুমি লেখাটা মূলত লিখেছ আমাকে কনফিউজ করার জন্য। আমি যতই পড়ছি ততই কনফিউজ হচ্ছি। ইবলিশ যেমন করে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশায় তুমি নিজেই তা করেছ। অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য গোপন করেছ। আবার অতি তুচ্ছ তথ্য খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করেছ।

সায়রা বানু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনার সমাধানটা কী বলুন।

মিসির আলি বললেন, সমাধান তুমি নিজেও করেছ। অনেক আগেই করেছ। তাই না?

হ্যাঁ।

তা হলে আমার কাছে এসেছ কেন?

কনফারমেশনের জন্য। আপনার যতটা আস্থা আপনার বুদ্ধির ওপর আছে আমার ততটা নেই।

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে—দাঁড়াতে বললেন, চা নিয়ে আসি। চা খেতে খেতে কথা বলি।

সায়রা বলল, আগে কথা শেষ হোক তারপর চা খাবেন।

মিসির আলি বসে পড়লেন। সায়রা বলল, চা এখন খেতে চাচ্ছি না কেন আপনাকে বলি। চা খেলেই আপনি সিগারেট ধরবেন। এমনিতেই আমার শ্বাসকষ্ট। সিগারেটের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টটা বাড়বে। এখন বলুন আপনার সমাধান।

মিসির আলি বললেন, তুমি তোমার স্বর পুরুষদের মতো করতে পার তাই না?

সায়রা বানু চমকাল না। সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ।

মিসির আলি বললেন, তোমার বোন যখন আলাদা ঘরে থাকা শুরু করল তুমি তখন জানালার বাইরে থেকে পুরুষের মতো গলা করে কথা বলতে। ইবলিশ শয়তান সেজে কথা বলা।

সায়রা বলল, হ্যাঁ। ও আলাদা থাকতে গেল তখন আমার খুব রাগ লাগল। আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলাম, যাতে সে আবার আমার সঙ্গে থাকতে শুরু করে।

ইবলিশ শয়তান সেজে তুমি তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলেছ?

হ্যাঁ বলেছি।

ওনাকে ভয় দেখাতে চেয়েছ?

হ্যাঁ। বাবাকে ভয় দেখানো জরুরি ছিল।

তুমি তোমার মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে যে—বর্ণনা দিয়েছ সে বর্ণনাটা ভুল। তুমি লিখেছ ছাদের ঠিক যে—জায়গা থেকে পড়ে গিয়ে ইথেনের মৃত্যু হয়েছে তোমার মার মৃত্যুও সেখান থেকে পড়েই হয়েছে। অথচ তোমার মার মৃত্যু এ বাড়িতে হয় নি।

সায়রা বলল, এ বাড়িতে হয় নি এটা ঠিক তবে তাঁর মৃত্যু ছাদ থেকে পড়েই হয়েছিল।

মিসির আলি বললেন, তোমাদের বাড়ির পুরোনো ইলেকট্রিসিটি বিলগুলি ঘেঁটে আমি একটা মজার তথ্য পেয়েছি। দেখলাম পাঁচ মাস তোমরা এই বাড়িতে ছিলে না।

সায়রা বলল, এই তথ্যটা মজার কেন?

এই তথ্যটা মজার কারণ তখন প্রশ্ন আসে এই পাঁচ মাস তোমরা কোথায় ছিলে। হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে কেন?

সায়রা বলল, আপনি ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছেন যে আমরা ইথেনের বাচ্চা ডেলিভারির জন্য বাইরে গিয়েছি। কিন্তু আমি তো খাতায় লিখেছি ইথেনের পোষ্টমর্টেম করা হয়। তার পেটে কোনো বাচ্চা পাওয়া যায় নি।

মিসির আলি বললেন, এমন কি হতে পারে না যে ঐ পাঁচ মাস তোমরা গোপনে কোথাও ছিলো। ইথেনের বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাটাকে কোথাও দত্তক দিয়ে তোমরা চলে এসেছ।

সায়রা বলল, চাচা। আপনি চা খেতে চেয়েছিলেন চা খান। মেয়েটা কোথায় ওকে বলুন চা দিতে।

মিসির আলি বললেন, মেয়েটিকে আমি ইচ্ছা করেই আজ বাসায় রাখি নি। আমি চাচ্ছিলাম না আমাদের কথাবার্তার সময় সে থাকুক। আমার এক বন্ধু আছে নাম হারুন বেপারী। নাসরিনকে পাঠিয়েছি ঐ বাড়িতে। আজ সারা দিন সে ঐ বাড়িতে থাকবে। চা আমাকেই বানাতে হবে। সায়রা তোমার জন্য কি বানাব?

হ্যাঁ।

মিসির আলি চা এনে দেখেন সায়রা কাঁদছে। নিঃশব্দ কান্না। তিনি সায়রার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। সায়রা নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিল। ক্ষীণ গলায় বলল, আপনি ইচ্ছা করলে সিগারেট ধরাতে পারেন।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন।

সায়রা বলল, কথা শেষ করুন।

মিসির আলি বললেন, ইথেনের মৃত্যুর পর রমনা থানায় একজন মহিলা এবং একজন পুরুষের টেলিফোন কলটা খুবই রহস্যজনক। আমি তোমাদের ঐ বাড়িটি দেখতে গিয়েছি। গাছগাছালিতে ঢাকা বাড়ি। এই বাড়ির ছাদে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা দূরের অ্যাপার্টমেন্ট হাউস থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। অথচ এর মধ্যে একজন দেখে ফেলল ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি। অন্ধকারে কোনো রঙ দেখা যায় না। কাজেই যে বলেছে ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি তাকে দেখতে হয়েছে খুব কাছ থেকে। কিংবা সে জানে যে হত্যাকাণ্ডটি করেছে তার গায়ে ছিল ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি। ঐ ভয়াবহ দিনে তোমার বাবার গায়ে ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি ছিল?

হ্যাঁ।

মিসির আলি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, টেলিফোন দুটা আমার ধারণা তুমি করেছ প্রথমে মেয়ের গলায় তার পরপরই পুরুষের গলায়।

আমি টেলিফোন করব কেন?

দুটা কারণে করবে। যাতে তোমার বাবা তোমাকে সন্দেহ না করেন। যাতে তোমার বাবার ধারণা হয় কাজটা ইবলিশ শয়তান করেছে। তোমার বাবার রূপ ধরে সে ছাদে গেছে। তোমার বোনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে।

সায়রা বলল, আপনার ধারণা ইথেনকে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলেছি?

মিসির আলি বললেন, আমি এই বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত।

সায়রা বলল, হত্যাকারীর মোটিভ থাকে। আমার মোটিভ কী?

মিসির আলি বললেন, পুরো ঘটনা আমি যদি অন্যভাবে সাজাই তা হলে তোমার একটা মোটিভ বের হয়ে আসে। সাজাব?

সাজান। তার আগে আমার একটা প্রশ্ন, আপনার ধারণা আমি একজন ভয়ংকর হত্যাকারী। মোটামুটি ইবলিশ শয়তানের কাছাকাছি। তাই যদি হয় আমি আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসব কেন? আপনাকে তা হলে আমার প্রয়োজন কেন?

মিসির আলি বললেন, আমাকে তোমার কেন প্রয়োজন সেটা পরে বলি? আগে পুরো ঘটনা অন্যভাবে সাজাই?

হ্যাঁ সাজান।

তুমি লিখেছ ইথেনের মৃত্যু যেভাবে হয়েছে তোমার মার মৃত্যুও সেভাবে হয়েছে। তা হলে ধরে নেই। তুমি নিজেই তোমার মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছ। কেন ফেলেছ আমি জানি না। এই অংশটি আমার কাছে পরিষ্কার না। আমার ধারণা এই মৃত্যু বিষয়ে তোমার বাবার মনে কিছু খটকা ছিল। খটকা দূর করার জন্য ইবলিশ শয়তানের উপস্থিতি তুমি কাজে লাগালে। সায়রা তুমি কি আরেক কাপ চা খাবে?

না।

তুমি চাইলে আমি আলোচনা বন্ধ রাখতে পারি।

আপনার যা বলার বলুন আমি শুনছি।

মিসির আলি বললেন, ইথেনের পেটে সন্তান আসার অংশটিকেও আমি সম্পূর্ণ অন্যভাবে সাজাব। যেভাবে সাজাব তাতে জিগ-স পাজল খাপে-খাপে মেলে। সন্তানটি আসলে এসেছিল তোমার পেটে। সন্তানটি তুমি নষ্ট কর নি। যে পাঁচ মাস তোমরা বাইরে ছিলে সেই পাঁচ মাসে সন্তানটি পৃথিবীতে আসে এবং তাকে কোথাও দত্তক দেওয়া হয়। ইথেন পুরো বিষয়টি জানে। তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া তোমার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইথেন নামের মেয়েটা পেটে কথা রাখা টাইপ মেয়ে না। তাকে বিশ্বাস করা যায় না। ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ ঠিক বলেছেন।

তোমার লেখা তিনটা চ্যাপ্টার আমি পড়ে ফেলেছি। এই তিন চ্যাপ্টারে তুমি তোমার স্বামীর কথা কিছুই লেখ নি। আমি তাঁর সম্পর্কে সামান্যই জানি। শুধু এইটুকু জানি যে তিনি অসুস্থ। তাঁর সম্পর্কে আমরা কম জানি কারণ তুমি জানাতে চাচ্ছ না। তাঁর অসুখটা কী?

ডাক্তার ধরতে পারছে না। দেশের ডাক্তাররা দেখেছে। বাইরের ডাক্তাররাও দেখেছে। শুরুতে ক্যানসার ভাবা হয়েছিল। এখন ভাবা হচ্ছে না। যতই দিন যাচ্ছে সে দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোনো কিছু খেতে পারে না। হজম করতে পারে না।

মিসির আলি বললেন, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে?

সায়রা সামান্য চমকাল। তবে সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ।

মিসির আলি বললেন, আর্সেনিক পয়েজনিং বলে একটা বিষয় আছে। খাবারের সঙ্গে যদি অতি সামান্য পরিমাণ হেভি মেটাল যেমন আর্সেনিক, এন্টিমনি কিংবা লেড দেওয়া হয় তা হলে শরীরের কলকবাজা এমনভাবে নষ্ট হবে যে ডাক্তাররা তার কারণ ধরতে পারবে না। হেভি মেটাল জড়ো হবে চুলের গোড়ায়। চুল পড়তে শুরু করবে। হেভি মেটালের সাহায্যে মানুষ খুন করার সহজ বুদ্ধির জন্যে একজন রসায়নবিদ দরকার। বুঝতে পারছ?

পারছি।

এই মানুষটাকে সরিয়ে দেবার চিন্তা তোমার মাথায় এসেছে কারণ তোমার মনে ভয় ঢুকে গেছে যে এই মানুষটা তোমার অতীত ইতিহাস জেনে ফেলবে। তুমি তোমার সন্তানকে প্রটেস্ট করতে চেয়েছ। ভালো কথা তোমার এই সন্তানের বাবা কি তোমার প্রাইভেট টিচার রকিব সাহেব?

হ্যাঁ।

উনি কোথায়?

জানি না কোথায়। তার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।

মিসির আলি বললেন, এখন আমি বলি তুমি আমার কাছে কেন এসেছ?

সায়রা বলল বলুন।

সিরিয়েল কিলাররা অহংকারী হয়। তাদের ধারণা জন্মে যায় কারোরই সাধ্য নেই তাদের অপরাধ ধরার। তারা বুদ্ধির খেলা খেলতে পছন্দ করে। অন্যকে বুদ্ধিতে হারাতে পছন্দ করে। তুমি আমার কাছে বুদ্ধির খেলা খেলতে এসেছি। এটা ছাড়াও তুমি তোমার মেয়ের জন্য একটি ভালো আশ্রয়ও চাচ্ছিলে। তোমার কাছে মনে হয়েছিল আমি একটা ভালো আশ্রয়। নাসরিন কি তোমার মেয়ে না?

হ্যাঁ।

ইথেন যে চিঠি তার মেয়েকে লিখেছিল বলে তুমি উল্লেখ করেছ সেই চিঠি আসলে তোমার লেখা। তুমি তোমার মেয়েকে লিখেছ। ইথেন আর্টসের ছাত্রী। ফরমালডিহাইড কী তা সে জানে না। তুমি জান। তোমার ব্যাপারটা আমি ধরতে পারি এই চিঠি পড়ে। তোমার খাতায় এই চিঠিটা যদি না থাকত তা হলে আমি মনে হয় না তোমাকে ধরতে পারতাম।

সায়রা কাঁদছে। মিসির আলি কঠিন গলায় বললেন, শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট থেকে কয়েকটা লাইন বলি। লাইনগুলি নিশ্চয়ই তোমার পরিচিত।

And my ending is despair
Unless be relieved by prayer,
As you from crimes would pardoned be,

সায়রা চোখ মুছতে মুছতে বলল,
But release me from my bands
With the he of your good hands.

মিসির আলি বললেন, পুলিশকে সবকিছু খুলে বললে কেমন হয়। সায়রা?

সায়রা বলল, আপনি বলতে বললে আমি অবশ্যই বলব।

মিসির আলি বললেন, তুমি কী করবে বা করবে না সেটা তোমার ব্যাপার। আমি কাউকে উপদেশ দেই না। ভালো কথা তুমি একবার বলেছিলে তোমার বাবার হাতের রান্না খাওয়াবে। মনে আছে? ওনার সঙ্গে আমার দেখা করার শখ আছে। একজন পুণ্যবান মানুষ

কী করেন জান? তিনি যখন কাউকে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন তখন তাঁর অন্ধকার নিজের ভেতর নিয়ে নেন।

সায়রা বলল, চাচা। আপনি কি আমাকে একটু হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেবেন?

মিসির আলি বললেন, না। কিন্তু তার পরেও হাত বাড়িয়ে দিলেন।